বাংলা সাহিত্য



নীরজ কুমার মুখোপাধ্যায়

Reccommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VII, Vide Notification No. T.B/76/7/TB/48 and also Board's Letter N. RB/76 DS/1. Dated 24.12.76

বাংলা সাহিত্য

(সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য)

শ্রীনীরজ কুমার মুখোপাধ্যায় এম. এ., বি. টি.

শিক্ষক

ঝাঁপড়দহ ডিউক ইন্‌স্টিটিউশান, দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ, ডোমজুড়, হাওড়া।

প্রাপ্তিস্থান :

দেবেন্দ্র গ্রন্থালয়

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক
বি. চক্রবর্ত্তী
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৭৬।
দ্বিতীয় প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৮২

মূল্য : পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর
শ্রীশক্তিপদ মণ্ডল
মণ্ডল প্রিন্টার্স
২০৯/বি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ

বাল্যস্মৃতি



[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ, বাংলা গদ্যের অন্যতম স্থপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁর দয়া, পৌরুষ, তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, ইত্যাদি গুণের জন্যই বোধহয় তিনি আরও বড় মানুষ। বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আইন পাশ করান, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে সমগ্রজাতি তাঁয় কাছে ঋণী। সুপণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য বই হ'ল বর্ণপরিচয়, আখ্যানমঞ্জরী, ভ্রান্তিবিলাস, বোধোদয় ইত্যাদি।]

প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাঁধা-রাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন। তিনি আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, ও শিল নয়, উহার নাম মাইলষ্টোন। আমি বলিলাম, বাবা, মাইলষ্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইংরেজী কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ; ষ্টোন শব্দের অর্থ পাথর; এই রাস্তার আধ আধ ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পোতা আছে; উহাতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক খোদা রহিয়াছে; এই পাথরের অঙ্ক উনিশ; ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে, এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল, অর্থাৎ, সাড়ে নয় ক্রোশ। এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।

নামতায় "একের পিঠে নয় উনিশ" ইহা শিখিয়াছিলাম। দেখিবা-মাত্র আমি প্রথমে এক অঙ্কের, তৎপরে নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, তবে এইটি ইংরেজীর এক, আর এইটি ইংরেজীর নয়।

অনন্তর বলিলাম, তবে বাবা, ইহার পর যে পাথরটি আছে, তাহাতে আঠার, তাহার পরটিতে সতর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক পর্য্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব। তিনি বলিলেন, আজ দুই পর্য্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইবে, প্রথম মাইলষ্টোন যেখানে পোতা আছে, আমরা সেদিক দিয়া যাইব না। যদি দেখিতে চাও, একদিন দেখাইয়া দিব। আমি বলিলাম সেটি দেখিবার আর দরকার নাই; এক অঙ্ক এইটিতেই দেখিতে পাইয়াছি। বাবা, আজ পথে যাইতে যাইতেই, আমি ইংরেজীর অঙ্কগুলি চিনিয়া ফেলিব।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রথম মাইলষ্টোনের নিকট গিয়া, আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। মনবেড়ে চটীতে দশম মাইল-ষ্টোন দেখিয়া, পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, বাবা, আমার ইংরেজী অঙ্ক চিনা হইল। পিতৃদেব বলিলেন, কেমন চিনিয়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম, এই তিনটি মাইলষ্টোন ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমি এটি নয়, এটি আট, এটি সাত, এইরূপ বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পর আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে, ইহা জানিয়া চালাকি করিয়া, নয়, আট, সাত বলিতেছি। যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কৌশল করিয়া, তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইলষ্টোনটি দেখিতে দিলেন না; অনন্তর, পঞ্চম মাইলষ্টোনটি দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন মাইলষ্টোন বল দেখি। আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা, এই মাইলষ্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে। এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া, পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন; তিনি

আমার চিবুকে ধরিয়া "বেশ বাবা বেশ" এই কথা বলিয়া, অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন, পিতৃদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, দাদামহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখা-পড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে মানুষ হইতে পারিবেক। যাহা হউক, আমার এই পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা সকলে যেমন আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আহ্লাদ দেখিয়া, আমিও তদনুরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলাম।

মাইলষ্টোনের উপাখ্যান শুনিয়া, পিতৃদেবের পরামর্শদাতা আত্মীয়েরা একবাক্য হইয়া, "তবে ইহাকে রীতিমত ইংরেজী পড়ান উচিত" এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিলেন। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে, সিদ্ধেশ্বরী তলার ঠিক পূর্ব্বদিকে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। উহা হের সাহেবের স্কুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরামর্শদাতারা ঐ বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, উহাতে ছাত্রেরা বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে ; এ স্থানে ইহাকে পড়িতে দাও ; যদি ভাল শিখিতে পারে, বিনা বেতনে হিন্দু কলেজে পড়িতে পাইবেক ; হিন্দু কলেজে পড়িলে ইংরেজীর চূড়ান্ত হইবেক। আর, যদি তাহা না হইয়া উঠে, মোটামুটি শিখিতে পারিলেও, অনেক কাজ দেখিবেক ; কারণ, মোটামুটি ইংরেজী জানিলে, হাতের লেখা ভাল হইলে ও যেমন তেমন জমা-খরচ বোধ থাকিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে ও সাহেবদের বড় বড় দোকানে অনায়াসে কর্ম্ম করিতে পারিবেক।

অনুশীলনী

১। বিদ্যাসাগর ইংরাজী অঙ্কগুলি কিভাবে শিক্ষা করলেন, সংক্ষেপে লেখ।

২। "যাহা হউক আমার এই পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা সকলে যেমন আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আহ্লাদ দেখিয়া আমিও তদনুরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলাম।"— আমি কে ? পরীক্ষাটি কি ? আহ্লাদিত হওয়ার কারণ কি ?

৩। শব্দার্থ ও বাক্যরচনা কর :—

প্রস্তর, ক্রোশ, কৌশল, সমভিব্যাহারীরা, আহ্লাদিত, সম্ভাষণ, পরামর্শদাতা।

৪। টীকা লেখ :—

মাইলষ্টোন, চটী, বীরসিংহ, ইংরেজী কালেজ, সওদাগর সাহেব।



[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতকদ্বয়ের অন্যতম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৪ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা গদ্য-সাহিত্য ও উপন্যাসের উন্নতিসাধন ও পরিপুষ্টি বিধানে তাঁর দান অপরিমেয়। বাংলাভাষায় প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তাঁরই। সাহিত্যে জাতীয়তার উদ্গাতা হিসাবে তিনি পরবর্তীকালে আখ্যাত হন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ৮ই এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়। বর্তমান পাঠ্যাংশটি তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাস থেকে সঙ্কলিত।]

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সেই জনহীন কানন,—এতক্ষণ অন্ধকার, শব্দহীন ছিল—এখন আলোকময়—পক্ষিকূজনশব্দিত হইয়া আনন্দময় হইল। সেই আনন্দময় প্রভাতে, আনন্দময় কাননে, "আনন্দমঠে" সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্মে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। কাছে বসিয়া জীবানন্দ। এমন সময়ে ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মচারী বিনা বাক্যব্যয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন, কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। পরে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন হইলে, ভবানন্দ, জীবানন্দ উভয়ে তাঁহাকে প্রমাণ করিলেন এবং পদধূলি গ্রহণপূর্বক বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন। তখন সত্যানন্দ ভবানন্দকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথোপকথন হইল তাহা আমরা জানি না। তাহার পর উভয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিলে ব্রহ্মচারী সকরুণ সহাস্য বদনে মহেন্দ্রকে কহিলেন, "বাবা, তোমার দুঃখে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, কেবল সেই দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী-কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কল্যাণীর রক্ষাবৃত্তান্ত বর্ণিত করিলেন। তারপর বলিলেন যে, "চল, তাহারা যেখানে আছে, তোমাকে সেখানে লইয়া

যাই।” এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল, অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। এই নবারুণ প্রফুল্ল প্রাতঃকালে যখন নিকটস্থ কানন সূর্যালোকে হীবকখচিতবৎ জ্বলিতেছে, তখনও সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার। ঘরের ভিতরে কি আছে মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না—দেখিতে দেখিতে ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিতহৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত। মধু-কৈটভস্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্তমূর্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্তিমান রাগরাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিণী মূর্ত্তি—লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী, সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্যান্বিতা। গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে। ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর, অতি ভীত স্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সকল দেখিতে পাইতেছ?” মহেন্দ্র বলিল, “পাইতেছি।”

ব্রহ্ম—বিষ্ণুর কোলে কি আছে দেখিয়াছ?

মহে—দেখিয়াছি। কে উনি?

ব্রহ্ম—মা।

মহে—মা কে?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, “আমরা যাঁর সন্তান।”

মহেন্দ্র—কে তিনি?

ব্রহ্ম—সময়ে চিনিবে। বল—বন্দে মাতরম্। এখন চল, দেখিবে চল।

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইনি কে?”

ব—মা—যা ছিলেন।

ম—সে কি?

ব—ইনি কুঞ্জর-কেশরী প্রভৃতি বন্যপশুসকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্যপশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্বালঙ্কার পরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্যশালিনী। ইঁহাকে প্রণাম কর।

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাহাকে এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, "এই পথে আইস।" ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলো আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখ, মা যা হইয়াছেন।"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, "কালী।"

ব—কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা, এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিণী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন। হায় মা!

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দরদর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাতে খেটক খর্পর কেন?"

ব্রহ্ম—আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বল, বন্দে মাতরম্।

'বন্দে মাতরম্' বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিল। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এই পথে আইস।" এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারিদিক হইতে মধুকণ্ঠ পক্ষিকুল গাহিয়া উঠিল। দেখিলেন, এক মর্মর প্রস্তর নির্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণ নির্মিত

দশভূজা প্রতিমা নবারুণ কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন, "এই মা—যা হইবেন। দশভূজা দশদিকে প্রসারিত, —তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি-শোভিত, পদতলে শত্রু-বিমর্দিত পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগভূজা—" বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদগদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। "দিগভূজা—নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী,—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িণী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ ; এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।" তখন দুইজনে যুক্তকরে উর্দ্ধমুখে এককণ্ঠে ডাকিতে লাগিল,—

"সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥"

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে মহেন্দ্র গদগদকণ্ঠে, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার এ-মূর্তি কবে দেখিতে পাইব ?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেইদিন উনি প্রসন্ন হইবেন।"

অনুশীলনী

১। "দিগভূজা—নানাপ্রহরধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী,—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান-দায়িণী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, এস, আমরা মাকে প্রণাম করি।"

—উদ্ধৃতিটি কোন্ রচনার অন্তর্গত ? লেখক কে ? রচনাটি লেখকের কোন্ উপন্যাসের অংশবিশেষ ? উক্তিটি কাহার ? 'দিগভূজা' বলিতে কাহাকে বুঝান হইয়াছে ? আলোচ্য অংশে অন্যান্য কোন্ কোন্ দেবদেবীর বর্ণনা আছে ? বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িণী দেবী কে ? গণেশকে 'কার্যসিদ্ধিরূপী' বলা হইয়াছে কেন ?

২। "সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোঽস্তুতে ॥"

—উদ্ধৃতিটির অর্থ নিজ ভাষায় লিখ।

৩। "চল, তাহারা যেখানে আছে, তোমাকে সেখানে লইয়া যাই।"—উক্তিটি কার? কাকে উদ্দেশ্য করে এই উক্তিটি করা হ'ল? 'তাহারা' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে?

৪। "বিষ্ণুর কোলে কি আছে দেখিয়াছ?"—প্রশ্নকর্তা কে? কাহাকে প্রশ্ন করলেন? মূর্তিটির বর্ণনা দাও।

৫। "মা'র এ মূর্তি কবে দেখিতে পাইব?"—কে বললেন? প্রশ্নকর্তা কি উত্তর পেলেন? 'মাতৃমূর্তি' গদ্যাংশটি থেকে মা'র বিভিন্ন মূর্তির বর্ণনা দাও।

৬। শব্দার্থ লেখ :—

পক্ষিকুজনশব্দিত, সমাপন, প্রকোষ্ঠ, নবারুণ, চতুর্ভুজ, সর্বাভরণভূষিতা বালার্কবর্ণাভা, ভুগর্ভস্থ, মর্মরপ্রস্তর, দশভুজা, বীরকেশরী, মধুকণ্ঠ।

আলোচ্য গদ্যাংশে মা'র বিভিন্ন মূর্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

তিনুবাবুর সত্য সাপের গল্প

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

[ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৩) জন্মস্থান চব্বিশ পরগণা জেলার শ্যামনগরের একটি গ্রাম। সরস ভঙ্গীতে, প্রাঞ্জল ভাষায় উদ্ভট হাসির গল্প লিখে বাংলা সাহিত্যে তিনি নিজের আসন স্থায়ী করে নিয়েছেন। এ জাতীয় গল্প লেখায় তিনি যে শুধুমাত্র পথিকৃৎ তাই নয়,—সমজাতীয় সাহিত্যে তিনি অনন্য বললেই হয়। বিদ্বান ত্রৈলোক্যনাথের বিখ্যাত বই 'কঙ্কাবতী'।]

আড্ডাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "নূতন গল্প, না পুরাতন গল্প ?" তিনুবাবু উত্তর করিলেন, "আনকোরা টনটনে টাটকা গল্প।" আড্ডাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্য গল্প ? না মিথ্যা কল্পিত বানান গল্প ?"

তিনুবাবু উত্তর করিলেন, "সম্পূর্ণ সত্য গল্প। যাহা আমার নিজের বাড়ীতে ঘটিয়াছে, যাহা আমি নিজে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সেইরূপ গল্প আমি করিব। এই যে সর্প ইহারা নাগ জাতি। মানুষ অপেক্ষা ইহাদের বুদ্ধি শতগুণে অধিক। ইহাদের বুদ্ধি বিষয়ে আজ আমি দুই-তিনটি দৃষ্টান্ত দিব।"

"আমার বড় মেয়েটি যখন দশ বৎসরে, তখন একদিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমি রথ দেখিতে যাইতেছিলাম। মেয়েটির চুল বড় দীর্ঘ ছিল না, কেবল কাঁধের উপর পড়িত ; গৃহিণী তাহার সাজগোজ করিয়া চুলগুলি একটি সবুজ ফিতা দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। যাইতে যাইতে একটি আমবাগানের নীচে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় মেয়ের মাথা হইতে ফিতাটি খুলিয়া বাতাসে কোথায় উড়িয়া গেল। আর খুঁজিয়া পাইলাম না। মেয়ের চুল এলোথেলো হইয়া পড়িল। দুইহাত মাথায় দিয়া মেয়ে

আমার কাঁদিতে লাগিল। এইস্থানে একটি আমডাল ঝুলিয়াছিল। লাউডগা সাপ জানেন? সেই সুন্দর উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের সরু সাপ? যাহারা গাছের পাতার সঙ্গে মিশিয়া থাকে? সেইস্থানে সেই আমডালে পাতার ভিতর লাউডগা সাপের একটি ছানা ছিল।

মেয়ের কান্না শুনিয়া সাপের ছানাটি ডাল হইতে তড়াক করিয়া মেয়ের কাঁধের উপর পড়িল। তাহার পর মস্তকের উপর উঠিয়া প্রথমে মুখ ও লেজ দিয়া চুলগুলি পরিষ্কার ও সমান করিল। কিন্তু হায়! ছানা সাপ! বেড় দিতে আর কুলান হইল না। সে পুনরায় গাছের ডালে গিয়া উঠিল, ডালে উঠিয়া ঘাড় নাড়িল। তখন আমরা আর কি করি!

মেয়ের চুল বাঁধা হইল না। সেই আলুথালু চুলে মেয়েকে সঙ্গে লইয়া চলিলাম। প্রায় দুইশত হাত আগে গিয়াছি, তখনও সে আমবাগান পার হই নাই, এমন সময়ে দেখি না, আর একটি আমগাছের ডাল হইতে একটি বড় লাউডগা সাপ সহসা লাফ দিয়া টপ করিয়া মেয়ের মাথার উপর পড়িল। চাহিয়া দেখি যে, সে ছানা-সাপটিও ডালে বসিয়া আছে। দুইটি সাপে অতি দ্রুতবেগে দৌড়িয়া আসিয়া থাকিবে। কারণ, দুই জনেরই ঘনঘন শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছিল, দুইজনেই গলদঘর্ম হইয়া গিয়াছিল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ছানা-সাপটি নিজে চুল বাঁধিতে না পারিয়া, তাহার মাকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া আনিয়াছে। ডালে ছানা ও আমার মেয়ের মাথায় তাহার মা। দুইজনে চক্ষুঠারে প্রথম যেন কি বলাবলি করিল। তাহার পর বড় সাপটি মেয়ের চুলগুলির গোড়ায়, যেস্থানে ফিতা ছিল. সেইখানে আপনার শরীরটি জড়াইল। অবশেষে মাথার ঠিক মাঝখানে, যেস্থানে ফিতার ফাঁস থাকে, সেইস্থানে আপনার মুখটি রাখিল। তাহার পর মুখের ভিতর আপনার লেজটি প্রবিষ্ট করিয়া সাপটি নিদ্রা গেল। তাহার মুখ ও লেজ সংলগ্ন হইয়া চমৎকার ফুলকাটা ফাঁসের মত হইল ও সাপটি নিজে অতি সুন্দর রেশমী সবুজ ফিতার ন্যায়

দেখাইতে লাগিল। রথা দেখা হইলে বাটী প্রত্যাগমন করিয়া সাপটিকে আমরা উঠানে লাউমাচায় ছাড়িয়া দিলাম। প্রতিদিন বৈকাল বেলা, মেয়ের চুল বাঁধিবার সময়, সে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে ডাকিতে হয় না। আমার গৃহিণী সাপটিকে লইয়া মেয়ের চুল বাঁধিয়া দেন। হয় না, চলুন, এখনি আমার দেশে চলুন, স্বচক্ষে সাপটিকে দেখিয়া আসিবেন।

অড্ডাধারী—"আর আছে?"

তিনু উত্তর করিলেন,—"আরও? আমার গৃহিণী অনেক জানেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাকে আরও অনেক সাপের কথা বলিব। আপাতত কেবল আর একটি বলিয়া শেষ করি।" আমার আট বৎসরের একটি বালক আছে। স্কুলে সে পড়িতে যায়। বাড়িয়া আসিয়া যোগ করিবার নিমিত্ত মাস্টার তাহাকে এক তেরিজ দিয়াছিলেন। স্লেটে লিখিয়া অঙ্কটি ছেলেটি ঘরে আনিয়াছিল। বালক অনেক করিল; কিন্তু অঙ্কটি বড় ছিল। কিছুতেই সে পরিল না। হতাশ হইয়া বিরস বদনে স্লেটের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার কাঁধের উপর বসিয়া একটি সাপ মুখ বাড়াইল। তাহার পর সাপটি আরও অগ্রসর হইয়া পেনসিল সমেত তাহার দক্ষিণ হস্তে অনেকগুলি পাক দিয়া জড়াইয়া ধরিল। এইরূপে বালকের হাত ধরিয়া স্লেটের উপর তাহাকে লিখাইতে লাগিল। মুহূর্ত মধ্যে বিনা ভুলে যোগটি তাহাকে সমাপ্ত করাইল।

তাহার পরদিন আমরা সকলে মিলিয়া বালককে আরও কঠিন অঙ্ক দিলাম। বালক যোগও ভাল করিয়া শিক্ষা করে নাই। কিন্তু সেই সর্পের সহায়তায় মুহূর্তের মধ্যে সমুদয় অঙ্কগুলি সে করিয়া ফেলিল। সেই অবধি সাপটিকে আমরা পুষিয়া রাখিয়াছি। সংসার-খরচের হিসাব, গয়লার সহিত দুধের হিসাব, ধোপার সহিত কাপড়ের হিসাব, আমাদের সামান্য একটু পৈতৃক সম্পত্তির হিসাব,—কড়ায় গণ্ডায় সমুদয় হিসাব সেই সাপটি রাখে। জমিদারী সেরেস্তার হিসাবের গোলমাল হইলে, সাপটি ভাড়া দিয়া

আমরা বিলক্ষণ দু'পয়সা উপার্জন করি। তাহাকে আমার মাহিনা দিতে হয় না, খাইতে দিতেও হয় না। সাপটি বনে চরিয়া আসে। তবে ভাল ব্যাঙ পাইলে, সমাদর করিয়া কখনও কখনও তাহাকে নিমন্ত্রণ করি।

আড্ডাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কোন্ জাতীয় সাপ? এ সাপের নাম কি?"

তিনু উত্তর করিলেন, "ইহার নাম শঙ্খচূড়। হিসাব-পত্রে এ জাতীয় সাপ সাক্ষাৎ শুভঙ্কর।"

তিনুবাবুর গল্পে সকলেই বিস্মিত হইলেন। সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

অনুশীলনী

১। "সম্পূর্ণ সত্য গল্প। যাহা আমার নিজের বাড়ীতে ঘটিয়াছে, যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এইরূপ গল্প আমি করিব।"—বক্তা কে? কাহার উদ্দেশ্যে বক্তা ইহা বলেছে? লেখকের অনুসরণে গল্পটি বল।

২। "সেই অবধি সাপটিকে আমরা পুষিয়া রাখিয়াছি।"—এখানে কোন্ সাপের কথা বলা হয়েছে? সাপটিকে পুষিয়া রাখার কারণ কি? সাপটি কি কি কাজ করে?

৩। "ইহার নাম শঙ্খচূড়। হিসাবপত্রে এ জাতীয় সাপ সাক্ষাৎ শুভঙ্কর।"—শঙ্খচূড় কে? শুভঙ্করের পরিচয় দাও।

৪। "আমার বড় মেয়েটি······ডালে উঠিয়া ঘাড় নাড়িল।"—গল্পের এই অংশটিকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর। এই রূপান্তর করতে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ পদের পরিবর্তন হ'চ্ছে বল।

৫। নীচের শব্দগুলির অর্থ বল ও স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর:

তেরিজ, আড্ডাধারী, সেরেস্তা, গলদঘর্ম, ঘোরতর, কুলান।

এই গল্পাংশে সাপ সম্পর্কে মজার কাহিনী তৈরী করা হয়েছে।



[রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ক'লকাতার ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তাঁর গড়ে ওঠার সহায়ক হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের সমস্ত শাখা তাঁর বিপুল সাহিত্যকর্মের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বর্তমান বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরই প্রচেষ্টার ফসল।]

অমল ॥ পিসেমশায় !

মাধবদত্ত ॥ কি অমল ?

অমল ॥ আমি কি ওই উঠোনটাতেও যেতে পারব না ?

মাধবদত্ত ॥ না বাবা !

অমল ॥ ওই যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন, ওই দেখো-না যেখানে ভাঙা ডালের খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের ওপর ভর দিয়ে বসে কাঠবিড়ালি কুটুস্ কুটুস্ করে খাচ্ছে—ওখানে আমি যেতে পারব না ?

মাধবদত্ত ॥ না বাবা !

অমল ॥ আমি যদি কাঠবিড়ালি হতুম বেশ হত। কিন্তু পিসেমশায়, আমাকে কেন বেরোতে দেবে না ?

মাধবদত্ত ॥ কবিরাজ যে বলেছে, বাইরে গেলে তোমার অসুখ করবে।

অমল ॥ কবিরাজ কেমন করে জানলে ?

মাধবদত্ত ॥ বল কী অমল ! কবিরাজ জান্‌বে না ! সে যে এতো বড়ো বড়ো পুঁথি পড়ে ফেলেছে।

অমল ॥ পুঁথি পড়লেই কি সমস্ত জানতে পারে?

মাধবদত্ত ॥ বেশ! তাও বুঝি জানো না।

অমল ॥ (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমি যে পুঁথি কিছুই পড়িনি—তাই জানিনে।

মাধবদত্ত ॥ দেখো, বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা সব তোমারই মতো—তারা ঘর থেকে তো বেরোয় না

অমল ॥ বেরোয় না?

মাধবদত্ত ॥ না, কখন্ বেরোবে বলো। তারা বসে বসে কেবল পুঁথি পড়ে, আর কোনদিকেই তাদের চোখ নেই। অমলবাবু, তুমিও বড়ো হলে পণ্ডিত হবে—বসে বসে এই এতো বড়ো বড়ো সব পুঁথি পড়বে—সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে।

অমল ॥ না না, পিসেমশায়, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হব না।

মাধবদত্ত ॥ সে কী কথা অমল! যদি পণ্ডিত হতে পারতুম তাহলে আমি তো বেঁচে যেতুম।

অমল ॥ আমি, যা আছে সব দেখব—কেবলই দেখে বেড়াব।

মাধবদত্ত ॥ শোনো একবার! দেখবে কী? দেখবার এত আছেই বা কী?

অমল ॥ আমাদের জানালার কাছে বসে সেই-যে দূরে পাহাড় দেখা যায়, আমার ভারী ইচ্ছে করে ওই পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই।

মাধবদত্ত ॥ কী পাগলের মতো কথা! কাজ নেই, কর্ম নেই, খামকা পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই। কী যে বলে তার ঠিক নেই। পাহাড়টা যখন মস্ত বেড়ার মতো উঁচু হয়ে আছে তখন তো বুঝতে হবে ওটা পেরিয়ে যাওয়া বারণ—নইলে এত বড়ো বড়ো পাথর জড়ো করে এত বড়ো একটা কাণ্ড করার দরকার কী ছিল!

অমল ॥ পিসেমশায়, তোমার কি মনে হয় ও বারণ করছে ? আমার ঠিক বোধ হয় পৃথিবীটা কথা কইতে পারে না, তাই অমনি করে নীল আকাশে হাত তুলে ডাকছে। অনেক দূরের যারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে তারাও দুপুরবেলা একলা জানালার ধারে বসে ওই ডাক শুন্‌তে পায়। পণ্ডিতরা বুঝি শুনতে পায় না ?

মাধবদত্ত ॥ তারা তো তোমার মতো খেপা নয়, তারা শুনতে চায়ও না।

অমল ॥ আমার মতো খেপা আমি কালকে একজনকে দেখেছিলুম।

মাধবদত্ত ॥ সত্যি নাকি ? কি রকম শুনি।

অমল ॥ তার কাঁধে এক বাঁশের লাঠি। লাঠির আগায় একটা পুঁটুলি বাঁধা। তার বাঁ-হাতে একটা ঘটি। পুরানো এক-জোড়া নাগরা জুতো পরে সে এই মাঠের পথ দিয়ে ওই পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছিল ; আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কোথায় যাচ্ছ ? সে বললে, কি জানি, যেখানে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন যাচ্ছ ? সে বললে, কাজ খুঁজতে যাচ্ছি। আচ্ছা, পিসেমশায়, কাজ কি খুঁজতে হয় ?

মাধবদত্ত ॥ হয় বৈকি। কতলোক কাজ খুঁজে বেড়ায়।

অমল ॥ বেশ তো। আমিও তাদের মতো কাজ খুঁজে বেড়াব।

মাধবদত্ত ॥ খুঁজে যদি না পাও ?

অমল ॥ খুঁজে যদি না পাই তো আবার খুঁজবো। তারপরে সেই নাগরা জুতো পরা লোকটা চলে গেল, আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। সেই যেখানে ডুমুর গাছের তলা দিয়ে ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে সেইখানে সে লাঠি নামিয়ে রেখে ঝর্ণার জলে আস্তে পা ধুয়ে নিলে—তারপরে

পুঁটুলি খুলে ছাতু বের করে জল দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে আবার পুঁটুলি বেঁধে ঘাড়ে করে নিলে—পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়ে সেই ঝর্ণার ভিতর নেমে জল কেটে কেটে কেমন পার হয়ে চলে গেল। পিসিমাকে বলে রেখেছি, ওই ঝর্ণার ধারে গিয়ে একদিন আমি ছাতু খাব।

মাধবদত্ত ॥ পিসিমা কী বললে?

অমল ॥ পিসিমা বললেন, তুমি ভাল হও, তারপর তোমাকে ওই ঝর্ণার ধারে নিয়ে গিয়ে ছাতু খাইয়ে আনব। কবে আমি ভাল হব?

মাধবদত্ত ॥ আর তো দেরি নেই বাবা!

অমল ॥ দেরী নেই? ভালো হলেই কিন্তু আমি চলে যাব।

মাধবদত্ত ॥ কোথায় যাবে?

অমল ॥ কত বাঁকা বাঁকা ঝর্ণার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হতে হতে চলে যাব—দুপুর বেলায় সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকে তখন আমি কোথায় কত দূরে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব।

মাধবদত্ত ॥ আচ্ছা বেশ, আগে তুমি ভালো হও, তার পরে তুমি—

অমল ॥ তারপরে আমাকে পণ্ডিত হতে বলো না পিসেমশায়!

মাধবদত্ত ॥ তুমি কী হতে চাও বলো!

অমল ॥ এখন আমার কিছু মনে পড়ছে না—আচ্ছা, আমি ভেবে বলব।

মাধবদত্ত ॥ কিন্তু, তুমি অমন করে যে-সে বিদেশী লোককে ডেকে ডেকে কথা বোলো না।

অমল ॥ বিদেশী লোক আমার ভারী ভালো লাগে।

মাধবদত্ত ॥ যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যেত ?

অমল ॥ তাহলে তো সে বেশ হত। কিন্তু, আমাকে তো কেউ ধরে নিয়ে যায় না। সব্বাই কেবল বসিয়ে রেখে দেয়।

মাধবদত্ত ॥ আমার কাজ আছে, আমি চললুম—কিন্তু বাবা, দেখো, বাইরে যেন বেরিয়ে যেয়ো না।

অমল ॥ যাব না। কিন্তু পিসেমশায়, রাস্তার ধারের এই ঘরটিতে আমি বসে থাকব।

অনুশীলনী

১। নাট্যাংশের কথোপকথন নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লেখ।

২। "তারপরে আমাকে পণ্ডিত হতে বলো না পিসেমশায়।"—এই উক্তিটি কার ? কাকে বলা হয়েছে ? বক্তা কেন পণ্ডিত হতে চায় না ? তার আন্তরিক ইচ্ছাটি কি ?

৩। "আমার মতো আমি কালকে একজনকে দেখেছিলুম।"—কে এই খেপা ? বক্তা কে ? 'খেপা লোকটি'র সম্বন্ধে এই নাট্যাংশ হতে যা জানলে নিজের ভাষায় লেখ।

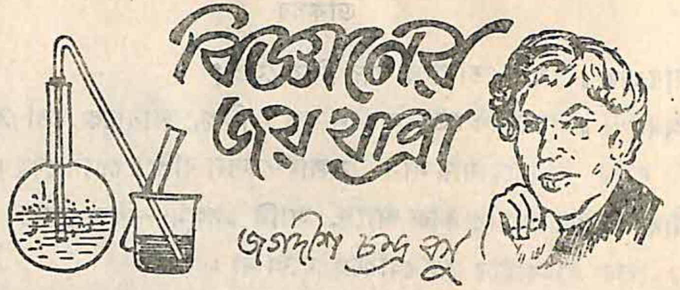
৪। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যরচনা কর ঃ

কবিরাজ, পুঁথি, পণ্ডিত, দীর্ঘনিশ্বাস, পুঁটলি, বিদেশী।

৫। (ক) সাধু ও চলতি ভাষায় পার্থক্য কিরূপে নিরূপণ করবে।

(খ) নিম্নলিখিত গদ্যাংশটিকে সাধু ভাষায় লেখ। কত বাঁকা বাঁকা ঝর্ণার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হতে হতে চলে যাব দুপুর বেলায় সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকে তখন আমি কোথায় কত দূরে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে চলে যাব।

আলোচ্য নাট্যাংশের [illegible] মাধবদত্ত ও অমলের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বৈষয়িক বুদ্ধি ও কোমলমতি [illegible] পরিস্ফুট হয়েছে।



[বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকা জেলার রাঢ়ীখাল গ্রামে জগদীশ বসুর পৈত্রিক নিবাস। উদ্ভিদের প্রাণ আছে—এই তত্ত্ব প্রমাণ করা ছাড়াও বেতার যন্ত্রের উদ্ভাবনে বৈজ্ঞানিক জগদীশ বসুর অবদান উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দির' আচার্যই স্থাপন করেন। ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন।]

প্রশান্ত মহাসাগরে অনেকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এই দ্বীপগুলি অতিক্ষুদ্র প্রবাল কীটের পঞ্জরে নির্মিত। অগণ্য কীট নিজ নিজ দেহ দ্বারা বহু বৎসরে এই দ্বীপগুলি নির্মাণ করিয়াছে।

আজকাল বিজ্ঞানের দ্বারা যে সকল অসাধ্য সাধিত হইতেছে, তাহা-ও বহু লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টার ফল। মানুষ পূর্বে একান্ত অসহায় ছিল। বুদ্ধি, চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার বলে আজ সে পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। কত কষ্ট ও কত চেষ্টার পর মনুষ্য বর্তমানে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। কে প্রথম আগুন জ্বালাইতে শিখাইল, কে প্রথমে ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা দিল, কে লেখার প্রথা আবিষ্কার করিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না। এইমাত্র জানি যে, প্রথমে যাঁহারা কোনও নূতন প্রথার প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পদে পদে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন। অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই কষ্টের পরেও অনেকে তাঁহাদের চেষ্টা সফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আপাততঃ মনে হয়, তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে বৃথা গিয়াছে, কিন্তু কোন

চেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না। আজ যাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়, দুইদিন পরে তাহা হইতে মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রবাল দ্বীপ যেমন একটু একটু করিয়া আয়তনে বর্দ্ধিত হয়, জ্ঞানরাজ্যও সেইরূপ তিল তিল করিয়া বাড়িতেছে। এ সম্বন্ধে দুইটি একটি ঘটনা বলিতেছি।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে ইটালি দেশে গ্যালভানি নামে একজন অধ্যাপক দেখিতে পাইলেন যে, লোহা ও তামার তার দিয়া মরা ব্যাঙকে স্পর্শ করিলে ব্যাঙ নড়িয়া উঠে। তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া এই ঘটনাটি সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সামান্য বিষয় লইয়া এত সময়ের অপব্যয় করিতে দেখিয়া লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। তাঁহার নাম হইল—'ব্যাঙ নাচানো অধ্যাপক।' বন্ধুরা আসিয়া বলিতে লাগিলেন—'মরা ব্যাঙ যেন নড়িল, কিন্তু ইহাতে লাভ কি?' কি লাভ?—সেই যৎ সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া বিদ্যুতের বিবিধ গুণ সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হইল। এই দেড়শত বৎসরের মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তি আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর ইতিহাস-ই যেন পরিবর্তিত হইয়াছে।

বিদ্যুৎ দ্বারা পথঘাট আলোকিত হইতেছে, গাড়ী চলিতেছে, মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ অন্য প্রান্তে পৌঁছিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটি যেন আমাদের ঘরের কোণে আসিয়াছে—দূর আর দূর নাই। পূর্বে আমাদের স্বর বাড়ির একদিক হইতে অন্যদিক পৌঁছিত না, এখন বিদ্যুতের বলে আমরা সহস্র ক্রোশ দূরের বন্ধুর সহিত কথাবার্তা বলিতেছি; এমন কি এই শক্তির সাহায্যে দূর দেশে কি হইতেছে, তাহা পর্যন্ত দেখিতে পাইব। আমাদের দৃষ্টি ও আমাদের স্বর আর কোন বাধা মানিবে না।

মনুষ্য এ পর্যন্ত জল ও স্থলের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত আকাশ জয় করিতে পারে নাই। ব্যোমযানে শূন্যে উঠা যায় বটে, কিন্তু বাতাসের প্রতিকূলে বেলুন চলিতে পারে নাই। আর একটু

অস্থবিধা এই যে রেশমের বেলুন হইতে অল্প সময়ের মধ্যে গ্যাস বাহির হইয়া যায়—এইজন্য বেলুন অধিক সময় শূন্যে থাকিতে পারে না।

এই অস্থবিধা দূর করিবার জন্য সোয়ার্জ নামে একজন জার্মান অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর বেলুন প্রস্তুত করেন। অ্যালুমিনিয়াম্ কাগজের ন্যায় হালকা অথচ ইহা ভেদ করিয়া গ্যাস বাহির হইতে পারে না। বেলুন যে ধাতুনির্মিত হইতে পারে ইহা কেহ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু তিনি সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহু বৎসরব্যাপী নিষ্ফল চেষ্টার পর অবশেষে বেলুন নির্মিত হইল। বেলুন যাহাতে ইচ্ছানুক্রমে বাতাসের প্রতিকূলে যাইতে পারে এজন্য একটি ক্ষুদ্র 'এঞ্জিন'ও তিনি প্রস্তুত করিলেন। জাহাজে যেমন জলের নীচে 'স্ক্রু' থাকে, এই স্ক্রু ঘুরাইলে জল কাটিয়া জাহাজ চলিতে থাকে, সেইজন্য বাতাস কাটিয়া চলিবার জন্য বেলুনে একটি বড় স্ক্রু-ও তিনি সংযুক্ত করিলেন। কিন্তু বেলুন নির্মিত হইবার অল্প পরেই সোয়ার্জের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তিনি সমস্ত সম্পত্তি ও জীবন যে কার্যে পণ করিয়াছিলেন তাহার ফল পরীক্ষা করিতে পারিলেন না। এতদিনের চেষ্টা নিষ্ফল হইতে চলিল। সোয়ার্জের সহধর্মিনী তখন জার্মান গভর্ণমেণ্টের নিকট বেলুন পরীক্ষা করিবার জন্য আবেদন করিলেন। বিধবার দুঃখ কাহিনী শুনিয়া গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া সেই বেলুন পরীক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ-বিভাগের কতিপয় অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিলেন। পরীক্ষকেরা দেখিলেন, বেলুনটি অতি প্রকাণ্ড এবং ধাতুর নির্মিত বলিয়া রেশমের বেলুন অপেক্ষা অনেক ভারী। তারপর বেলুন চালাইবার জন্য এঞ্জিন ও অনেক কল বেলুনে সংযুক্ত রহিয়াছে। এরূপ প্রকাণ্ড জিনিষ কখনও আকাশে উড়িতে পারে? যে সমস্ত কল অনাবশ্যক বলিয়া কাটিয়া ফেলা হইল, ঐ কলগুলি দ্বারা বেলুনকে ইচ্ছানুক্রমে দক্ষিণে, বামে, উর্দ্ধে ও অধোদিকে চালিত করা যাইত।

ইহার পর আরও এক বাধা পড়িল। বেলুন কে চালাইবে? যাহা হউক দর্শকদিগের মধ্য হইতে একজন ইঞ্জিনীয়ার সাধ্যমত কল চালাইতে

সম্মত হইলেন। কল চালান হইল, অমনি বেলুন পৃথিবী ছাড়াইয়া মহাবেগে শূন্যে উঠিল। তখন বাতাস বেগে বহিতেছিল, প্রতিকূল বাতাস কাটিয়া বেলুন ছুটিল। এতদিনে সোয়ার্জের চেষ্টা সফল হইল। কিন্তু লোকেরা যে সব কল অনাবশ্যক মনে করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল, স্বল্পকালের মধ্যেই তাহাদের আবশ্যকতা প্রমাণিত হইল। বেলুন আকাশে উঠিল বটে কিন্তু তাহা সামলাইবার কল না থাকাতে অল্পক্ষণ পরেই ভূমিতে পতিত হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল। তথাপি সকলে বুঝিতে পারিলেন, সোয়ার্জ যে অভিপ্রায়ে বেলুনটি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা কোনও দিন হয়ত সফল হইবে।

পাখীরা কত সহজে উড়িয়া বেড়ায়। মানুষ কি কখনও পাখীর মত উড়িতে পারিবে? তোমাদের কি কখনও পাখীর মত উড়িবার ইচ্ছা হয় নাই। জার্মান দেশে লিলিয়ানথাল মনে করিলেন, আমরা কেন পাখীর মত আকাশে ভ্রমণ করিতে পারিব না? তিনি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক পরীক্ষার পর নানাপ্রকার পাখা প্রস্তুত করিলেন এবং সেগুলি বাহুতে বাঁধিয়া পাহাড় হইতে ঝাপ দিয়া পাখায় ভর করিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। একবার তাহার মনে হইল যে দুইটি পাখার পরিবর্তে যদি অধিক সংখ্যক পাখার ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে উড়িবার বেশী সুবিধা হইতে পারে। চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, তাহাই ঠিক।

বিশ বৎসর পর্যন্ত অতি সাবধানে তিনি এইসব পরীক্ষা করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি যে কল প্রস্তুত করিলেন তাড়াতাড়িতে তাহা পূর্বের মতন দৃঢ় হইল না, তিনি সেই অসম্পূর্ণ কল লইয়াই উঠিতে চেষ্টা করিলেন। এবার অতি সহজেই বাতাস কাটিয়া যাইতেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে হঠাৎ বাতাসের ঝাপটা লাগিয়া উপরের একখানা পাখা ভাঙ্গিয়া গেল। এই দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু তিনি পরীক্ষা দ্বারা যে সব নূতন তথ্য আবিষ্কার করিলেন তাহা পৃথিবীর সম্পত্তি হইয়া রহিল। তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যের সাহায্যে পরে উড়িবার কল নির্মাণ সম্ভব হইয়াছে।

ইহার পর মার্কিণ দেশের অধ্যাপক ল্যাঙ্গলি পাখাযুক্ত উড়িবার কল প্রস্তুত করিলেন, তাহাতে অতি হালকা একখানি ইঞ্জিন সংযুক্ত ছিল। কিন্তু কর্মকারকের শৈথিল্যবশতঃ একটি স্ক্রু ঢিলা হইয়া গিয়াছিল। ইঞ্জিন চালাইবার পর কল আকাশে উঠিয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল। হঠাৎ ঢিলা স্ক্রু খুলিয়া যাওয়ায় কলটি নদীগর্ভে পতিত হইল। এই বিফলতার দুঃখে ল্যাঙ্গলি ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুগ্রস্ত হইলেন।

ল্যাঙ্গলির মৃত্যুর পর তাহারই স্বদেশীয় উইল্‌বার রাইট পুনরায় উড়িবার কলের পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। উড়িবার সময় একবার কল খসিয়া যাওয়াতে আকাশ হইতে পতিত হইয়া রাইটের একখানা পা ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতেও ভীত না হইয়া রাইট পুনরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন এবং সেই চেষ্টার ফলে মানুষ আজ গগনবিহারী হইয়া নীলাকাশে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অনুশীলনী

১। "প্রবাল দ্বীপ যেমন একটু একটু করিয়া আয়তনে বর্দ্ধিত হয়, জ্ঞানরাজ্যও সেইরূপ তিল তিল করিয়া বাড়িতেছে।" অংশটি কোন প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত? প্রবন্ধকারের নাম কি? প্রবাল দ্বীপ কি? জ্ঞানরাজ্যের সঙ্গে প্রবালদ্বীপের তুলনা করা হইয়াছে কেন?

২। "এই সামান্য বিষয় লইয়া এত সময়ের অপব্যয় করিতে দেখিয়া লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত।"—সামান্য বিষয় বলিতে কোন ঘটনার কথা বলা হইয়াছে? কে সামান্য বিষয় লইয়া সময়ের অপব্যয় করিতেন? লোকে তাঁহাকে উপহাস করিয়া কি বলিত? এই সামান্য ঘটনার দ্বারা বিজ্ঞানের কি আবিষ্ক্রিয়া হইতে থাকে?

৩। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সোয়ার্জ নামে একজন জার্মান অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর বেলুন প্রস্তুত করেন"—এখানে কোন অসুবিধার কথা বলা

হইয়াছে? সোয়ার্জের পরিচয় দাও। তাঁহার স্ত্রী জার্মান সরকারের কাছে কি আবেদন করেন, এই আবেদনের ফল কি হইল?

৪। "জার্মান দেশের লিলিয়ানথাল মনে করিলেন, আমরা কেন, পাখীর মত আকাশে ভ্রমণ করিতে পারিব না"—লিলিয়ানথালের সম্বন্ধে কি জান? তিনি কি পরীক্ষা করিয়াছিলেন?

৫। রাইট ও ল্যাঙ্গলির সম্বন্ধে কি জান?

৫। (ক) বিপরীতার্থক শব্দ লেখ:

প্রতিকূল, বিধবা, মরা, ব্যয়, নিস্ফল।

(খ) শব্দার্থ লেখ ও বাক্যে প্রয়োগ কর:

পিঞ্জর, সহিষ্ণুতা, আবিষ্ক্রিয়া, আধিপত্য, প্রতিকূল, ব্যোমযান, গগনবিহারী।

৬। টীকা লেখ:—

(ক) ব্যাঙ্ নাচানো অধ্যাপক (খ) বেলুন, (গ) লিলিয়ানথলি।

(ঘ) চলিত ভাষায় লেখ।

ল্যাঙ্গলির মৃত্যুর পর তাহারই স্বদেশীয় উইলবার রাইট পুণরায় কলের পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। উড়িবার সময় একবার কল খসিয়া যাওয়াতে আকাশ হইতে পতিত হইয়া রাইটের একখানা পা ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতেও ভীত না হইয়া রাইট পুণরায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন এবং সেই চেষ্টার ফলে মানুষ আজ গগনবিহারী হইয়া নীলআকাশে সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টার ফলে মানুষ আজ [illegible] গগনবিহারী [illegible] নীলআকাশে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে — এই [illegible] সম্ভব হয়েছে।



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী

[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১০১৯) মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির অন্তর্গত টেঞা বৈদ্যপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র রামেন্দ্রসুন্দর সাধারণ মানুষের জন্য সহজ, সরল' প্রাঞ্জলভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার পথিকৃৎ। তাছাড়া তাঁর জীবনী সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ক রচনাও অতি সুখপাঠ্য। এমন যুক্তিপূর্ণ অথচ আবেগময় ভাষার প্রবন্ধকার সত্যিই বিরল।]

রত্নাকরের রামনাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা মরা মরা বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল।

এই পুরাতন পৌরাণিক নজিরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ওই নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বাক্‌সংযত কর্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্বস্ব সাধারণ বাঙালী, উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে স্বজাতীয় পরিচয়ে তাঁহার গুণকীর্তন দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মগৌরব জ্ঞাপন করিতে গেলে, বোধহয়, আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে। অণুবীক্ষণ নামে একপ্রকার যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়, কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট করিয়া দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন এবং এই যে বাঙালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও

অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল গিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে ; কাহারও সাধ্য নাই যে সেই চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কাল বিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা গবেষণার বিষয়।

অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্ত্যজাতিসুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ ; আমাদের মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকট নিষ্প্রভ ও মলিন।

যে পুরুষাকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যাহা বর্তমান, সাধারণ বাঙালীর চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে ; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টকসমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলিকে দলিয়া চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সেস্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্যন্ত একেবারেই প্রবেশ লাভ করে নাই। পরবর্তী জীবনে তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্ত্য মানুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা যে তাঁহার চরিত্রকে কোনরূপ পরিবর্তিত করিয়াছিল তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তাহার

পূর্বেই সম্যক্‌ভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল ; আর নূতন মালমসলা সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। তিনি ঠিক যেমন বাঙালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষদিন পর্যন্ত তেমনি বাঙালীটিই ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনোরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাব মোচন না করিয়া পারিতেন না। দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। এই লক্ষণের দ্বারা তাঁহার মানবপ্রীতি অন্যদেশের মানবপ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল।

[এই লেখাটি লেখকের 'চরিতকথা' বই থেকে সংক্ষেপিত করে দেওয়া হয়েছে।]

অনুশীলনী

১। আমাদের পক্ষে বিদ্যাসাগরের নামগ্রহণ কেন 'আস্পর্ধা' মনে হ'তে পারে? এ প্রসঙ্গে রত্নাকর দস্যুর উপাখ্যানটির উল্লেখের সার্থকতা বুঝিয়ে দাও।

২। 'বিদ্যাসাগর খাটি বাঙালী ছিলেন'—আলোচনা কর।

৩। বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষণার বৈশিষ্ট্য কি?

৪। সহজ করে বুঝিয়ে দাও :

(ক) "বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত ......নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ।"

(খ) "এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে......স্পর্শ করে।"

৫। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যরচনা কর :

প্রকারান্তরে, উদ্রেক, হিতৈষণা, সংস্পর্শে, অস্তিত্ব, মানবপ্রীতি, পাশ্চাত্ত্য, সম্যগ্‌ ভাবে, প্রাচ্য।

বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মত কঠিন,
ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল — [illegible]



[বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষকে সাহিত্যের উপজীব্য করে আমাদের অতিপরিচিত ঘটনার বাস্তব ও পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তিনি অসাধারণ দক্ষতায় অতুলনীয় গদ্যে চিত্রিত করেছেন। গৃহদাহ, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। ইনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী পরলোক গমন করেন।]

সারাদিন আকাশে ছেঁড়া-মেঘের বিরাম ছিল না; এখন অপরাহ্ণের কাছাকাছি একটা গাঢ় কালো মেঘ দিক্-চক্রবাল আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, সমস্ত খালাসীদের মুখে-চোখেই কেমন যেন একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। তাহাদের চলা-ফেরার মধ্যেও একপ্রকার ব্যস্ততার লক্ষণ—যাহা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করি নাই।

একজন বৃদ্ধ গোছের খালাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "চৌধুরীর পো, আজ রাত্রেও কি কালকের মত ঝড় হইবে মনে হয়?"

বিনয়ে চৌধুরীর পুত্র বশ হইল। দাঁড়াইয়া কহিল, "কর্ত্তা, নীচে যাও, কাপ্তেন কইছে ছাইক্লোন হোতি পারে।"

মিনিট-পনের পরে দেখিলাম, কথাটা অমূলক নয়। উপরের যত যাত্রী ছিল, সকলকে একরকম জোর করিয়া খালাসীরা হোল্‌ডের মধ্যে নামাইয়া দিতে লাগিল। দুই-চারিজন আপত্তি করায় সেকেণ্ড অফিসার নীচে আসিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়া বিছানাপত্র পা দিয়া গুটাইয়া দিতে লাগিল। আমার তোরঙ্গ, বিছানা খালাসীরা ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া গেল; কিন্তু আমি নিজে আর একদিকে সরিয়া

পড়িলাম। শুনিলাম, যে হতভাগ্যরা দশ টাকার বেশী ভাড়া দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে জাহাজের খোলের মধ্যে পুরিয়া গর্তের মুখ আঁটিয়া বন্ধ করা হইবে।

জাহাজের মঙ্গলের জন্যও বটে আর তাহাদের মঙ্গলের জন্যও বটে, এইরূপ বিধি। আমাদের কিন্তু নিজের জন্য কল্যাণের ব্যবস্থা কিছুতেই মনঃপুত হইল না।

অনেকক্ষণ হইতেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যার কাছাকাছি বাতাস এবং বৃষ্টির বেগ উভয়ই বাড়িয়া উঠিল ; এমন হইয়া উঠিল যে, পলাইয়া বেড়াইবার আর যো রহিল না, যেখানে হৌক, সুবিধামত একটু আশ্রয় না লইলেই নয়। সন্ধ্যার আঁধারে যখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন উপরের ডেক জনশূন্য। মাস্তলের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঠিক সম্মুখের বুড়ো কাপ্তেন দূরবীণ হাতে ব্রিজের উপর ছুটাছুটি করিতেছেন। হঠাৎ তাঁর সুনজরে পড়িয়া গিয়া পাছে এ কষ্টের পরেও আবার গর্তে গিয়া ঢুকিতে হয়, এই ভয়ে একটা সুবিধা গোছের জায়গা অন্বেষণ করিতে করিতে একধারে অচিন্তনীয় আশ্রয় মিলিয়া গেল। একধারে অনেকগুলো ভেড়া, মুরগী ও হাঁসের খাঁচা উপরি উপরি রাখা ছিল, তাহারই উপরে উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, এমন নিরাপদ জায়গা বুঝি সমস্ত জাহাজের মধ্যে আর কোথাও নাই। কিন্তু তখনও অনেক কথাই জানিতে বাকী ছিল।

বৃষ্টি, বাতাস, অন্ধকার এবং জাহাজের দোলন সবকটিই ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমুদ্র তরঙ্গের আকৃতি দেখিয়া মনে হইল বুঝি 'ছাইক্লোন' ; কিন্তু সে যে সাগরের কাছে গোষ্পদ-মাত্র, তাহা অস্থিমজ্জায় হৃদয়ঙ্গম করিতে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

হঠাৎ বুকের ভিতর কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী তীব্র বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নেই—সমস্ত ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত

আকাশ যেন হাল্কা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে। পরক্ষণেই একটা বিরাট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কানে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই এমন কিছুই জানি নাই।

ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুমার বুকের ভিতরে ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনিতাম, কোন এক রাজপুত্র একডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা তুলিয়া সাতশ' রাক্ষসীর প্রাণ সোনার ভোমরা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল, এবং সাতশ' রাক্ষসী মৃত্যু যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া-গুড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এ-ও যেন তেমনি কোথায় কি একটা বিপ্লব বাধিয়াছে। তবে রাক্ষসী সাতশ' নয়, শতকোটি—উন্মত্ত কোলাহল এদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়—সাইক্লোন।

এই দুর্জয় বায়ুর শক্তি বর্ণনা করা ত ঢের দূরের কথা, সমগ্র চেতনা দিয়া অনুভব করাও যেন মানুষের সামর্থের বাহিরে। জ্ঞান বুদ্ধি সমস্ত অভিভূত করিয়া শুধুমাত্র এমনি একটা অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল যে, দুনিয়ার মেয়াদ একেবারে নিঃশেষ হইতে বিলম্ব নাই। পাশেই যে লোহার খুঁটি ছিল, গলার চাদর দিয়া নিজেকে তাহার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলাম। অনুক্ষণ মনে হইতে লাগিল, এইবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আমাকে সাগরের মাঝখানে উড়াইয়া লইয়া ফেলিবে। হঠাৎ মনে হইল, জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ভিতরের ধাক্কায় বজ্‌বজ্‌ করিয়া উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে।

দূরে চোখে পড়িয়া গেল—দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল, এই বুঝি পাহাড়, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভ্রম যখন ভাঙ্গিল, তখন হাতজোড় করিয়া বলিলাম, ভগবান! এই চোখ দুটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আর তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে। এতদিন ধরিয়া ত সংসারের সর্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু তোমার এই সৃষ্টির তুলনা ত কখনও

দেখিতে পাই নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্তনীয় বিরাটকায় মহাতরঙ্গ মাথায় রজতশুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এতবড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি!

মনে মনে বলিলাম হে ঢেউ-সম্রাট! তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাহা হইবে সে ত আমি জানি-ই, কিন্তু এখনও ত তোমার আসিয়া পৌঁছিতে অন্ততঃ আধ মিনিটকাল বিলম্ব আছে; সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবর খানি যেন দেখিয়া লইতে পারি। একটা জিনিষের সুবিপুল উচ্চতা ও ততোধিক বিস্তৃতি দেখিয়াই কিছু এ ভাব মনে আসে না, কারণ তাহ'লে হিমালয়ের যে-কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ত যথেষ্ট। কিন্তু এই যে বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে, সেই অপরিমেয় গতি ও শক্তির অনুভূতিই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সমুদ্রজলে ধাক্কা দিলে যাহা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে, সেই জ্বালা নানা প্রকারের বিচিত্র রেখায় ইহার মাথার উপর খেলা করিতে না থাকিলে, এই গভীর কৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে হয়ত তেমন করিয়া দেখিতেই পাইতাম না। এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরেই এই আলোকমালা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল।

জাহাজের বাঁশি অসীম বায়ুবেগে থরথর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতে লাগিল; এবং ভয়ার্ত খালাসীর দল আল্লার কর্ণে তাহাদের আকুল আবেদন পৌঁছাইয়া দিতে গলা ফাটাইয়া সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

যাহার শুভাগমনের জন্য এত ভয়, এত হাঁক-ডাক, এত উদ্যোগ আয়োজন —সেই মহাতরঙ্গ আসিয়া পড়িলেন। প্রথমটা মনে হইল,—নিশ্চয়ই আমরা ডুবিয়া গিয়াছি। আশেপাশে উপরে নীচে চারিদিকেই কালো জল। জাহাজসুদ্ধ সবাই যে পাতালের রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন ভাবনা শুধু এই যে, খাওয়া দাওয়াটা

তথায় কি জানি কিরূপ হইবে। কিন্তু মিনিট-খানেক পরে দেখা গেল, না—ডুবি নাই, জাহাজসুদ্ধ আবার জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছি।

অতঃপর তরঙ্গের পর তরঙ্গেরও শেষ হয় না। আমাদের নাগরদোলা চাপারও আর সমাপ্তি হয় না। এতক্ষণে টের পাইলাম, কেন কাপ্তেন সাহেব মানুষগুলিকে জানোয়ারের মত ঘরে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়াছেন। ডেকের উপর দিয়া মাঝে মাঝে যেন জলের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল।

আমার নীচে হাঁস-মুরগীগুলো বারকতক ঝট-পট করিয়া এবং ভেড়াগুলো কয়েকবার ম্যা-ম্যা করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিল; আমি শুধু তাহাদের উপরতলা আশ্রয় করিয়া লোহার খুঁটি সবলে জড়াইয়া ধরিয়া ভবলীলা বজায় করিয়া চলিলাম। কিন্তু এখন আর এক প্রকারের বিপদ আসিয়া জুটিল। শুধু যে জলের ছাট সূঁচের মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল তাই নয়, সমস্ত জামা-কাপড় ভিজিয়া প্রচণ্ড বাতাসে এমনি শীত করিতে লাগিল যে, দাঁতে দাঁতে ঠক ঠক করিয়া বাজিতে লাগিল।

মনে হইল জলে ডোবার হাত হইতে যদি বা সম্প্রতি নিস্তার পাই, নিউমোনিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যে সত্যই অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তাহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম। সুতরাং যেমন করিয়া হৌক এস্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন কোথাও আশ্রয় লইতে হইবে, যেখানে জলের ছাট বল্লমের ফলার মত গায়ে বেঁধে না।

শুধু এক উপায় আছে। জাহাজের পার্শ্ব-পরিবর্তনের মধ্যে ছুট দিবার একটু অবকাশ পাওয়া যায়; অতএব এই সময়টুকুর মধ্যে আর কোথাও গিয়া যদি ঢুকিয়া পড়িতে পারি'ত বাঁচিতেও পারি। যে কথা সেই কাজ। কিন্তু খাঁচা হইতে অবতরণ করিয়া তিনবার ছুটিয়া ও তিনবার বসিয়া যদিবা সেকেণ্ড ক্লাসের কেবিনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দ্বার বন্ধ! লোহার কপাট হাজার ঠেলাঠেলিতেও পথ দিল না। সুতরাং আবার সেই পথ তেমনি করিয়া অতিক্রম করিয়া ফার্স্ট ক্লাসের দোরগোড়ায় আসিয়া হাজির

হইলাম। এবার ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইয়া নিরালা ঘরের মধ্যে আশ্রয় দিলেন। লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া শুইয়া পড়িলাম।

রাত্রি বারোটার মধ্যেই ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গেল বটে, কিন্তু পরদিন ভোর বেলা পর্যন্ত সমুদ্রের রাগ পড়িল না।

অনুশীলনী

১। "কর্তা নীচে যাও, কাপ্তেন কইছে ছাইক্লোন হোতি পারে।"—বক্তা কে? বক্তা কাহাকে কর্তা বলে সম্বোধন করছে? 'ছাইক্লোন' কি? 'কাপ্তেন' কথাটির দ্বারা কাহাকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে?

২। "তবে রাক্ষসী সাতশ' নয় শতকোটি—উন্মত্ত কোলাহল এদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয় সাইক্লোন।"

উদ্ধৃতিটি কোন রচনার অংশ? রচনাটি লেখকের কোন মূল রচনার অন্তর্ভুক্ত? উদ্ধৃতিটির বক্তা কে? কোন প্রসঙ্গে তিনি ইহা বলিয়াছেন? 'তবে রাক্ষসী সাতশ' নয়। শতকোটি—কথাটির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা কর।

৩। "লেখক ভয়ঙ্করতার মুখোমুখী দাঁড়িয়েও সুন্দরের মুখ দেখতে চেয়েছেন"—কোন ঘটনার দ্বারা এ' কথা প্রমাণ করা যায়?

৪। পদ পরিবর্তন কর :

বিনয়, মঙ্গল, বিধি, কল্যাণ, সমুদ্র, প্রান্ত, বিস্ময়, অনুভব, শক্তি।

৫। অর্থ লেখ ও বাক্যরচনা কর :

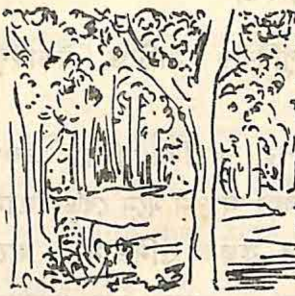
পরিত্যাগ, লেশমাত্র, ইতিপূর্বে, দুর্জয়, সমস্বরে।

৬। (ক) সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

আচ্ছন্ন, বৃষ্টি, অন্বেষণ, গোষ্পদ, উন্মত্ত, শুভাগমন।

(খ) কোন শ্রেণীর শব্দ বল।

দিক চক্র বলে, খালাসী, হোলডের, তোরঙ্গ, ডেক, হাঁস।



সরস্বতী কুণ্ডী

বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[পথের পাঁচালীর লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুরের মুরারিপুর গ্রামে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। নিসর্গের আত্মার রূপ তার সংবেদনশীল গদ্যে আশ্চর্যভাবে ধরা পড়েছে। এদিক থেকে ইনি অনন্য। পথের পাঁচালী, অপরাজিত, আরণ্যক, আদর্শ হিন্দু হোটেল ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-কর্ম। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ১লা নভেম্বর ইনি পরলোক গমন করেন। বর্তমান পাঠ্যাংশটি 'আরণ্যক' উপন্যাসের অংশবিশেষ।]

লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্ত খুব বড় একটা হ্রদের মত। এ রকম জলাশয়কে এদেশে বলে কুণ্ডী। এই হ্রদটার নাম সরস্বতী কুণ্ডী।

সরস্বতী কুণ্ডীর পারের তিন দিকে নিবিড় বন। এ ধরনের বন আমাদের মহালে বা লবটুলিয়াতে নাই। এ বনে বড় বড় বনস্পতিদের নিবিড় সমাবেশ —জলের সান্নিধ্য-বশতই হোক বা যে-জন্যই হোক বনের তলদেশে নানা বিচিত্র লতাপাতা, বন্য পুষ্পের ভিড়। এই বন বিশাল সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জলকে তিনদিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, একদিকে ফাঁকা—সেখান হইতে পূর্বদিকের বহুদূর-প্রসারিত নীল আকাশ ও দূরের শৈলমালা চোখে পড়ে। সুতরাং পূর্ব-পশ্চিম কোণের তীরের কোন এক জায়গায় বসিয়া দক্ষিণ ও বাম দিকে চাহিয়া দেখিলে সরস্বতী কুণ্ডীর সৌন্দর্য্যের অপূর্বতা ঠিক বোঝা যায়। বামে চাহিলে গভীর হইতে গভীরতর বনের মধ্যে দৃষ্টি চলিয়া গিয়া ঘন নিবিড় শ্যামলতার মধ্যে নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলে, দক্ষিণে চাহিলে স্বচ্ছ নীল জলের ওপারে সুদূরবিসর্পী আকাশ ও অস্পষ্ট শৈলমালার

ছবি মনকে বেলুনের মত ফুলাইয়া পৃথিবীর মাটিতে উড়াইয়া লইয়া চলে।

এখানে একখানা শিলাখণ্ডের উপর কতদিন গিয়া একা বসিয়া থাকিতাম। কখনও বনের মধ্যে দুপুরবেলা আপন মনে বেড়াইতাম। কত বড় বড় গাছের ছায়ায় বসিয়া পাখীর কূজন শুনিতাম। মাঝে মাঝে গাছপালা, বন্যলতার ফুল সংগ্রহ করিতাম। এখানে যত রকমের পাখীর ডাক শোনা যায়, আমাদের মহালে অত পাখী নাই। নানা রকমের বন্য ফল খাইতে পায় বলিয়া এবং সম্ভবত উচ্চ বনস্পতি শিরে বাসা বাঁধিবার সুযোগ ঘটে বলিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর তীরের বনে পাখীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। বনে ফুলও অনেক রকমের ফোটে।

হ্রদের তীরের নিবিড় বন প্রায় তিন মাইলের উপর লম্বা, গভীরতায় প্রায় দেড় মাইল। জলের ধার দিয়া বনের মধ্যে গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় একটা সুঁড়ি পথ বনের শুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত আসিয়াছে—এই পথ ধরিয়া বেড়াইতাম। পাছপালার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে সরস্বতীর নীল জল, তার উপর উপুড় হইয়া পড়া দূরের আকাশটা এবং দিগন্তলীন শৈলশ্রেণী চোখে পড়িত। ঝির্‌ঝির্ করিয়া স্নিগ্ধ হাওয়া বহিত, পাখী গান গাহিত, বন্য ফুলের সুগন্ধ পাওয়া যাইত।

একদিন একটা গাছের ডালে উঠিয়া বসিলাম। সে আনন্দের তুলনা হয় না। আমার মাথার উপর বিশাল বনস্পতিদলের ঘন সবুজ পাতার রাশি, তার ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের টুক্‌রা, প্রকাণ্ড একটা লতায় থোকা থোকা ফুল দুলিতেছে। পায়ের দিকে অনেক নীচে ভিজা মাটিতে বড় বড় ব্যাঙের ছাতা গজাইয়াছে। এখানে আসিয়া বসিয়া শুধু ভাবিতে ইচ্ছা হয়। কত ধরনের কত নব অনুভূতি মনে আসিয়া জোটে। একপ্রকার অতলসমাহিত অতিমানস চেতনা ধীরে ধীরে গভীর অন্তস্থল হইতে বাহিরের মনে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এ আসে গভীর আনন্দের মুর্তি ধরিয়া। প্রত্যেক

বৃক্ষলতার হৃৎস্পন্দন যেন্ নিজের বুকের রক্তের স্পন্দনের মধ্যে অনুভব করা যায়।

আমাদের যেখানে মহাল, সেখানে পাখীর এত বৈচিত্র্য নাই। সেখানটা যেন অন্য জগৎ, তার গাছপালা, জীবজন্তু অন্য ধরনের। পরিচিত জগতে বসন্ত যখন দেখা দিয়াছে, লবটুলিয়ায় তখন একটা কোকিলের ডাক নাই, একটা পরিচিত বসন্তের ফুল নাই। সে যেন রুক্ষ কর্কশ ভৈরবী মূর্ত্তি; সৌম্য, সুন্দর বটে, কিন্তু মাধুর্য্যহীন মনকে অভিভূত করে ইহার বিশালতায়, রুক্ষতায়। কোমল বর্জিত খাড়ব সুর, মালকোষ কিংবা চৌতালের ধ্রুপদ, মিষ্টত্বের কোন পর্দার ভারে মাড়াইয়া চলে না—সুরের গম্ভীর উদাত্ত রূপে মনকে অন্য এক স্তরে লইয়া পৌঁছাইয়া দেয়।

সরস্বতী কুণ্ডী সেখানে ঠুংরী, সুমিষ্ট সুরের মধুর ও কোমল বিলাসিতায় মনকে আর্দ্র ও স্বপ্নময় করিয়া তোলে। স্তব্ধ দুপুরে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এখানে তীর-তরুর ছায়ায় বসিয়া পাখীর কূজন শুনিতে শুনিতে মন কত দূরে কোথায় চলিয়া যাইত, বন্য নিমগাছের সুগন্ধি নিমফুলের সুবাস ছড়াইত বাতাসে, জলে জলজ লিলির ফুল ফুটিত। কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সন্ধার পর সেখান হইতে উঠিয়া আসিতাম।

অনুশীলনী

১। 'এই হ্রদটার নাম সরস্বতী কুণ্ডী'—হ্রদটি কোথায় অবস্থিত? কুণ্ডী শব্দের অর্থ কি?

২। 'এখানে আসিয়া বসিয়া শুধু ভাবিতে ইচ্ছা হয়। কত ধরনের কত নব অনুভূতি মনে আসিয়া জোটে। একপ্রকার অতল-সমাহিত অতিমানস চেতনা ধীরে ধীরে গভীর অন্তঃস্থল হইতে বাহিরের মনে ফুটিয়া উঠিতে থাকে।'—এখানে বলিতে কোন্ স্থানের কথা বলা হইয়াছে? অভিমানস চেতনা বলিতে কি বুঝ? এই অনুভূতি কে, কখন অনুভব করিয়াছিলেন?

৩। "বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি বর্ণনায় বিভূতিভূষণের জুড়ি খুব কমই আছে"—এই পাঠ্যাংশ হতে তোমরা কি এই উক্তিকে সমর্থন করার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছ? এ সম্পর্কে দশটি বক্যে তোমার যুক্তি প্রকাশ কর।

৪। 'কোমল বর্জ্জিত খাড়ব স্বর, মালকোষ, কিংবা চৌতালের ধ্রুপদ, মিষ্টত্বের কোন পর্দার ভারে মাড়াইয়া চলে না'—বক্তা কে? খাড়ব স্বর কি? মালকোষ কিংবা চৌতালের ধ্রুপদ বলিতে কি বুঝ?

৫। "সে যেন রুক্ষ কর্কশ ভৈরবী মূর্ত্তি; সৌম্য, সুন্দর বটে, কিন্তু মাধুর্য্যহীন মনকে অভিভূত করে ইহার বিশালতায়, রুক্ষতায়। কোমল বর্জিত খাড়ব স্বর, মালকোষ কিংবা চৌতালের ধ্রুপদ, মিষ্টত্বের কোন পর্দার ভারে মাড়াইয়া চলে না—স্বরের গম্ভীর উদাত্ত রূপে মনকে অন্য এক স্তরে লইয়া পৌছাইয়া দেয়। সরস্বতী কুণ্ডী সেখানে ঠুংরী, সুমিষ্ট স্বরের মধুর ও কোমল বিলাসিতায় মনকে আর্দ্র ও স্বপ্নময় করিয়া তোলে।"—এই অংশটি নিজের ভাষায় সহজ করে বুঝিয়ে লেখ।

৬। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যরচনা কর:

সুদূরবিসর্পী, শৈলমালা, শিলাখণ্ড, বনস্পতি, অন্তঃস্থল, বৈচিত্র্য, স্বপ্নময়, আর্দ্র, কর্কশ।

৭। (ক) পদ পরিবর্ত্তন কর:—নিবিড়, নীল, সৌন্দর্য্য, অপূর্বতা, লীন, সুন্দর, মধুর, বসন্ত।

(খ) বিপরীত শব্দ বল:—রুক্ষ, কর্কশ, কোমল, গম্ভীর, আনন্দ, অন্তস্থল, উচ্চ।

রচনাটিতে প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে। সরস্বতী কুণ্ডীর পাহাড়ের নিবিড় বনশ্রেণীর সৌন্দর্য মনে যে বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হয় তারও বর্ণনা রচনাটিতে পাওয়া যায়।



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

সুভাষচন্দ্র বসু

[ভারতবর্ষের ব্রিটিশসাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা সুভাষচন্দ্র-কটকে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কৃতী ছাত্র, তৎকালীন আই. সি. এস-এর চাকরীর মোহ ত্যাগ করে স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের পরিকল্পনা করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটি আজও রহস্যাবৃত।]

দেশবন্ধুর সহিত আমার শেষ দেখা আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। আরোগ্যলাভের জন্য এবং বিশ্রাম পাইবার ভরসায় তিনি সিমলা পাহারে গিয়াছিলেন। আমাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সিমলা হইতে রওনা হইয়া কলিকাতায় আসেন। আমাকে দেখিতে তিনি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দুইবার আসেন এবং আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয় আমার বহরমপুর জেলে বদলী হইবার পূর্বে।

প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হইলে আমি তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া বলিলাম, "আপনার সঙ্গে আমার বোধ হয় অনেকদিন দেখা হইবে না।" তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহের সহিত বলিলেন, "না, আমি তোমাদের শিগ্‌গীর খালাস করে আনছি।" হায়, তখন কে জানিত যে, ইহজীবনে আর তাঁহার দর্শন পাইব না? সেই সাক্ষাতের প্রত্যেক ঘটনাটি, প্রত্যেক দৃশ্যটি, প্রত্যেক ভাষাটি পর্যন্ত আমার মানসপটে চিত্রের ন্যায় আজও অঙ্কিত আছে এবং বোধকরি চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। তাঁহার সেই শেষ স্মৃতিটুকু আমার প্রাণের সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবের গূঢ় কারণ

কি, অনেকে এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি সর্বপ্রথমে অনুচর হিসাবে তাঁহার প্রভাবের একটি কারণ নির্দেশ করিতে চাই। আমি দেখিয়াছি তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেন। তাঁহার ভালবাসার উৎপত্তি হৃদয়ের সহজ প্রেরণা হইতে; সুতরাং তাঁহার ভালবাসা গুণীর গুণের উপর নির্ভর করিত না। যাহাদিগকে আমরা সাধারণতঃ ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলি, তিনি তাহাদিগকে বুকে টানিয়া লইতে পারিতেন; কত বিভিন্ন রকমের লোক তাঁহার হৃদয়ের টানে নিকটে আসিত এবং জীবনের কত ক্ষেত্রে এই নিমিত্ত তাঁহার প্রভাব ছিল! সমুদ্রে প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্তের ন্যায় এই বিপুল জনসমাজে তিনি চারিদিক হইতে সকল প্রাণকে আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন এরূপ কত দৃষ্টান্ত এখন চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। যাঁহারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট মাথানত করেন নাই, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হয়েন নাই, বিক্রমের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই, অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ধ হয়েন নাই, তাঁহারা পর্যন্ত ঐ বিশাল হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর তাঁহার সহকর্মীরা ছিলেন তাঁহার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁহাদের উপকার অথবা মঙ্গলের জন্য কি না করিতে প্রস্তুত ছিলেন? জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না—এ কথা একশোবার সত্য। দেশবন্ধুর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাঁহার অনুচরবর্গ এবং তাঁহার সহকর্মিগণ তাঁহার আদেশে কি না করিতে পারেন? কোনও ত্যাগ, কোনও কষ্ট, কোনও পরিশ্রম কি তাহাদের বিচলিত করিতে পারিত? অবশ্য জীবন দানের পরীক্ষা কোনও দিন হয় নাই—কিন্তু সে কথা বাদ দিলে বোধহয় বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহার কাজ করিতে গিয়া সানন্দে সকল প্রকার দুঃখ ও কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং তাহাতে গৌরব অনুভব করিয়াছিল। দেশবন্ধুও জানিতেন যে, তাঁহার অহিংসার সংগ্রামে তাঁহার এমন কতকগুলি সৈনিক আছে যাহাদের উপর

তিনি সর্বাবস্থায় নির্ভর করিতে পারেন। আজ আমি গর্বের সহিত বলিতে পারি দেশবন্ধুর পুণ্যজীবনের শেষদিবস পর্যন্ত তাঁহার শান্তিসেনা অটল্ অচল ভাবে সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে দেশবন্ধুর সুসংযত, কর্তব্যপরায়ণ, নির্ভীক অনুচর-বৃন্দকে দেখিয়া অনেক তথাকথিত জননায়ক ঈর্ষাপরায়ণ হইতেন, তাঁহারাও হয়ত মনে মনে ঐরূপ অনুচরবর্গ পাইতে ইচ্ছা করিতেন, কিন্তু মূল্য দিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। সহকর্মী বা অনুচরকে ভাল না বাসিতে পারিলে বিনিময়ে তাহার প্রাণ পাওয়া যায় না। সাধারণ সাংসারিক জীবের ন্যায় দেশবন্ধুর আত্ম-পর জ্ঞান ছিল না। তাঁহার বাড়ী সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। সর্বত্র এমন কি তাঁহার শয়ন-প্রকোষ্ঠেও সকলের গতিবিধি ছিল। তাঁহার অন্তরের ও বাহিরের সম্পদের উপর সকলের দাবি ছিল। তিনি তাঁহার অনুচরবৃন্দকে যে শুধু ভালবাসিতেন তাহা নয়, তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা সহিতেও প্রস্তুত ছিলেন। যাঁহারা ভিতরের খবর রাখেন না তাঁহারা দেশবন্ধুর সজ্ঘ-গঠনের অপূর্ব শক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইতেন—হইবারও কথা। কারণ দেশবন্ধু যাহা দেখাইয়া গেলেন তাহা ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন। আমি এইস্থলে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, তিনি যে পর্বতের ন্যায় অটল সজ্ঘ-গঠন করিয়াছিলেন তাঁহার মূলে ছিল নায়ক ও অনুচরবর্গের মধ্যে প্রাণের সংযোগ। ইহা ব্যতীত দোষ-গুণ-নির্বিশেষে ভালবাসিবার ক্ষমতার সাহায্যে এবং তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলের দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন পন্থী ও রুচির লোকদিগকে একত্র চালাইতে পারিতেন। তাঁহার দলের অন্তর্ভুক্ত নহেন, অথবা তাঁহার মত পোষণ করেন না এরূপ বহুলোক গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

অনেক তথাকথিত জননায়ক স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছিলেন যে, দেশবন্ধুর অনুচরবর্গ ও সহকর্মিগণ দাসত্বপরায়ণ ছিলেন। দেশবন্ধুর মন্ত্রণাগৃহে যাঁহারা কখনও উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা একথা আদৌ সমর্থন করিবেন বলিয়া আমার

মনে হয় না। আলোচনা ও পরামর্শের সময় যাহারা নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিল, তাহাদিগকে আমি কি করিয়া দাসত্বপরায়ণ বলি ? অধিকন্তু নায়কের সঙ্গে অনুচরবর্গের প্রায়ই তুমুল ঝগড়া হইত, দেশবন্ধু আলোচনার সময় কখনও কখনও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন বটে, কিন্তু স্পষ্টবাদীর উপর তিনি কোনও দিন মনে বিরক্ত হইতেন না। এমন কি, অনেকের ধারণা ছিল যে, যাহারা বেশী আপত্তি তুলিত তাহাদের কথা তিনি বেশী শুনিতেন। তবে এ'কথা সত্য যে, মতভেদ হইলেও তাঁহার অনুচরেরা অসংযত বা উচ্ছৃঙ্খল হইত না অথবা নেতার উপর আক্রোশবশতঃ প্রকাশ্যে গালাগালি করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিত না। দেশবন্ধুর সঙ্ঘের নিয়ম ছিল সংযম ও শৃঙ্খলা।

[মান্দালয় জেল থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬ তারিখে সুভাষচন্দ্র 'দেশবন্ধুর জীবনচরিত' গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে একটি চিঠি লেখেন। বর্তমান পাঠ্যাংশ ঐ চিঠির অংশবিশেষ।]

অনুশীলনী

১। "আপনার সঙ্গে আমার বোধ হয় অনেকদিন দেখা হইবে না।"—বক্তা কে ? কাহার উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলা হইয়াছে ? প্রত্যুত্তরে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কি বলিলেন ? বক্তার সঙ্গে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্ক কিরূপ ছিল ?

২। "আমি সর্বপ্রথমে অনুচর হিসাবে তাঁহার প্রভাবের একটি কারণ নির্দেশ করিতে চাই।"—আমি কে ? অনুচর শব্দটির অর্থ কি ? তাঁহার প্রভাব বলিতে কাহার প্রভাবের কথা বলা হইয়াছে ? অনুচরবৃন্দের উপর তাঁহার প্রভাবের কারণ কি ছিল ?

৩। "অনেক তথাকথিত জননায়ক স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে দেশবন্ধুর অনুচরবর্গ ও সহকর্মিগণ দাসত্বপরায়ণ ছিলেন"—তথাকথিত জননায়ক বলিতে কি বুঝ ? দেশবন্ধুর সমসাময়িক কয়েকজন তথাকথিত জননায়কের নাম বল। দেশবন্ধুর সহকর্মীরা যে দাসত্বপরায়ণ ছিলেন না একথা লেখক কিভাবে প্রমাণ করিয়াছেন ?

৪। অর্থ লেখ ও স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর :

সর্বতোমুখী, সম্যক, পন্থী, অলৌকিক, ইহজীবন, প্রকোষ্ঠ, ঈর্ষাপরায়ণ, নিঃসঙ্কোচ, নির্বিশেষ, ঘূর্ণাবর্ত, মানসপট, বিমোহিত, আদৌ, ব্রত।



হিমালয়ের পথে

প্রবোধ কুমার সান্যাল

[প্রবোধকুমার সান্যালের জন্ম কলকাতায় ১৩১৪ সালে। যাযাবর মনোবৃত্তি নিয়ে ঘুরেছেন জলে-স্থলে, বনে-পাহাড়ে। সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিয়েছেন তাঁর গল্পে, উপন্যাসে, ভ্রমণ-কাহিনীতে। এই পাঠ্যাংশটি 'মহাপ্রস্থানের পথে' গ্রন্থের অংশবিশেষ।]

আকাশ ঘন মেঘ ও কুয়াশায় প্রায় অন্ধকার! সোনা গেল বৎসরে কোন কোন দিন মাত্র এ রাজ্যে সূর্যকিরণ দেখা যায়। সম্মুখে সাদা তুষারময় পর্বতের কোলে কোলে মেঘ ভেসে চলেছে। ঠাণ্ডায় পা ঠিক পড়ছে না। দাঁতের ওপর দাঁত চেপে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। ইচ্ছা করছে ছুটোছুটি করি। মুখে-চোখে ছুঁচের মত তুষারের হাওয়া বিঁধছে, লাঠিটা বাগিয়ে ধরতে পারছিনে গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছি। বুকের মধ্যে দম আছে প্রচুর, কিন্তু পা ক্লান্ত হ'চ্ছে। একটু দাঁড়িয়ে আবার উঠতে থাকি। ব্যথা নেই, ক্লান্তি নেই উৎসাহহীন নই, পিছনের পথ কুয়াশায় অবলুপ্ত, সম্মুখে হিমালয়ের অনন্ত কুহেলিকা, পথের ধারে ধারে বরফের স্তূপ জমাট বেঁধে রয়েছে ঝরণাগুলি সাবানের ফেনার মত গলে পড়ছে। আজ আমার শরীরে ফিরে এসেছে পুরাতন শক্তি, দুরন্ত উদ্দীপনা। কোথায় হারিয়ে গেছে পিছনের পৃথিবী, কোথায় বিলীন হয়েছে আত্মীয় বন্ধুর দল—আজ আমি আর বিশ্রাম নেব না, তুচ্ছ দেহের অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেব না,—আজ বন্যার মত অপ্রতিহত গতিতে ছুটে যাব।

একবার দাঁড়ালাম, ছুটতে ছুটতে সকলকে পিছনে ফেলে এসেছি। চারিদিকে অকূল কুয়াশার মধ্যে কে কোথায় হারিয়ে গেছে, কেবল দেখা

যাচ্ছে দুইদিকে সামান্য পথরেখা। কোথাও বৃক্ষলতা নেই, বন-অরণ্য নেই, জীব-জানোয়ারের চিহ্ন মাত্র নেই, শুধু তুষারময় পর্বতমালা, অসংখ্য ঝরণা চিৎকার করতে করতে পথের ধারে নেমে আসছে। বামে দক্ষিণে পিছনে সম্মুখে মেঘের ঘনঘটাঃ বিলুপ্ত আকাশ, নিশ্চিহ্ন পৃথিবী। এবার চলছি হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে গর্জনমত্ত বায়ুবেগে, আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছিনে।

ক্রমে ক্রমে আলো প্রখর হয়ে উঠল। সে আলো আকাশের নয়, রৌদ্রের দীপ্তির নয়, বিদ্যুৎ বহ্নির নয়,—সে এক নতুন অলৌকিক আলো—তুষারশুভ্রতার তীব্র তীক্ষ্ণ আলো; আলোর স্রোত, আলোর সমুদ্র, আলোক-ধাঁধা চোখের দৃষ্টি উগ্র যন্ত্রণায় বুজে এল, চোখ জুড়ে বন্ধ হয়ে গেল। চোখে হাত চাপা দিয়ে অন্ধের মতো সঙ্কীর্ণ পথরেখার উপরে পা বুলিয়ে বুলিয়ে হাঁটছি। সে কি সর্বনাশা আলোকের উগ্রতা, তীরের মত চোখে এসে লাগে, যাত্রীরা পথভ্রষ্ট হয়ে হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ে যায়। দেখতে দেখতে আবার নতুন উপসর্গ দেখা দিল। উঠল ঝড়, ঝড়ের সঙ্গে শিউলি ফুলের মত তুষার বৃষ্টি, তার সঙ্গে দানাদানা জল, কি কঠিন ঠাণ্ডা! আঃ, আর বুঝি আত্মরক্ষা হ'লো না, আর কতদূর আছে কে জানে,—মন্দির আর কতদূরে? মাথার উপরে পড়ছে বরফ, কাঁধে পড়ছে বরফ, কম্বলটা বরফে সাদা হয়ে গেল, চোখে চাপা দিয়েও চোখ খুলতে পারছিনে, পাগলের মত ছোটবার চেষ্টা করলাম।

'আঁক'। পড়লাম পা পিছলে বরফের উপরে, পথ তুষারে ডুবে গেছে। একি, সত্যিই কি আমার শরীরে আর শক্তি নেই? শরীর পাথরের মতো অসাড় হয়ে আসছে কেন? এ কোথায় ছিটকে পড়েছি? হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কম্বলটা খুঁজে পেলাম। কত নীচে পড়েছি বোঝা গেল না। অনেক চেষ্টা করে চোখের পল্লব খুলে দেখি পাশেই একটা ছোট জলাশয় ঠাণ্ডায় জমে আয়নার কাঁচের মত কঠিন হয়ে গেছে! গা ঝাড়া দিয়ে আবার

উঠলাম, মিছরির ঢিবির মত বরফের স্তূপে পা পুঁতে গেছে। লাঠিটা আছে খাড়া দাঁড়িয়ে বরফের মধ্যে। যাক্ এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। কোমর পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে উঠে পক্ষাঘাত হয়েছে, উর্ধ্বে দেহটা কেবল বাকি। নিজেকে টানতে টানতে এগোচ্ছি, চোখ খুলতে পারলে দেখতাম আর কতদূরে! চোখে-মুখে পড়ছে তুষার ও জলের বিন্দু, মাথার চুল ভারী হয়ে উঠেছে, পরণের গৈরিক সজ্জা মোলায়েম তুষারে আচ্ছন্ন হলো। মিট্‌মিট্ করে একবার তাকানর চেষ্টা করলাম। সম্মুখে তুষারের পুষ্পবৃষ্টি রূপার ঝালরের মত ছলমল করছে, মাথার উপরে তুষারের চন্দ্রাতপ। কি অনির্বচনীয় রূপগৌরব! শঙ্খধ্বনি শুনছি। কাঁসর-ঘণ্টার বুঝি আওয়াজ আসছে! কোনদিকে? উত্তরে, না দক্ষিণে? আবার কান পেতে শুনলাম, কিন্তু আর যে চলতে পারছিনে, একটিবার শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নেবো? কিন্তু শুলেই যে থামতে হবে, অন্তিম মুহূর্তের থামা। হাত-পাগুলো আর কথা শুনতে চাইছে না!

মন্দাকিনী দুধগঙ্গার পুলের কাছাকাছি এসে গেছি। কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ অদূরে আবার শোনা গেল। দু'চারজন যাত্রীদূরে ছায়ার মত নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। পুল পার হয়ে সামান্য লোকালয় ও কয়েকটা পাথরের ঘর, দু'একটি দোকান, পথগুলি বাঁধানো। ঘর-দুয়ার, দোকান-পাট, পথঘাট সমস্তই কঠিন বরফের স্তূপে ঢাকা। তার উপর দিয়েই আনাগোনা চলছে। পথ ঘুরেই সম্মুখে তুষারময় হিমালয়ের পটভূমিকায় কেদারনাথের মন্দির দেখা গেল। সম্মুখে প্রস্তরময় বেদিকার উপরে পথের দিকে পিছন ফিরে বিরাট পাথরের ষাঁড় উপবিষ্ট। চোখে বরফের আলো এতক্ষণে একটু সয়ে গেছে। এবারে হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি আঙ্গুলের ডগাগুলো ঠাণ্ডায় ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে, পায়ের চামড়া ফেটে গেছে। তা যাক্, বাইরে পাদুকা ত্যাগ করে এই রূপবান মন্দিরের ঘনান্ধকার অন্দরে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করলাম। ভিতরে জনকয়েক অর্ধ-উন্মত্ত স্ত্রী-পুরুষ

যাত্রী কেদারনাথের বিপুল দেহের উপর ওলোট-পালট খাচ্ছে। কেদারনাথ মূর্তিমান ন'ন কর্কশ অসমতল বড় একটি পাথরের খণ্ড,—তা হোক, তাকেই আলিঙ্গন করে কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ চিৎকার করছে, কেউ ধরছে গান, কেউ করছে আর্তনাদ ও করুণ মিনতি, কেউ বা শীতবিদীর্ণ রক্তাক্ত মুখে তাকে পাগলের মত চুম্বন করছে। উল্লাস, আর্তস্বর, পূজাপাঠ, স্তব-মন্ত্র, স্নেহ-ভালবাসা, ভক্তি ও আনন্দ, কিন্তু স্থাণু ও বধির প্রস্তরস্তূপ অচঞ্চল নীরবতায় তেমনি করেই পড়ে রইল।

অনুশীলনী

১। "ক্রমে ক্রমে আলো প্রখর হয়ে উঠলো।"—কোন্ আলোর কথা বলা হয়েছে? আলো প্রখর হয়ে ওঠায় পথযাত্রীদের কি অসুবিধা হল?

২। 'স্থাণু ও বধির প্রস্তরস্তূপ অচঞ্চল নীরবতায় তেমনি করেই পড়ে রইল।'—এই কথা কোন্ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে? 'স্থাণু ও বধির প্রস্তরস্তূপটি' কি?

৩। কেদারনাথের পথে লেখকের যাত্রার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৪। (ক) "আজ আমি আর বিশ্রাম নেব না, তুচ্ছদেহের অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেব না,—আজ বন্যার মত অপ্রতিহত গতিতে ছুটে যাব"—অংশটি কোন্ রচনার অন্তর্ভুক্ত, রচনাটির লেখক কে? উক্তিটি কাহার? কোন্ প্রসঙ্গে বক্তা উক্তিটি করিয়াছেন? তিনি বিশ্রাম লইবেন না কেন? তুচ্ছ দেহের অভাব-অভিযোগ বলিতে কি বুঝ? বন্যার মত অপ্রতিহত গতি অংশটি ব্যাখ্যা কর।

(খ) "কিন্তু শুলেই যে থামতে হবে, অন্তিম মুহূর্তের থামা। হাত-পাগুলো আর কথা শুনতে চাইছে না"—অনুভূতিটি কাহার, কখন তাঁহার এইরূপ বোধ হইয়াছিল? শুলেই থামতে হবে কেন, অন্তিম মুহূর্তের থামা বলিতে কি বুঝ? হাত-পাগুলো বক্তার কথা শুনতে চাইছে না কেন?

৫। শব্দার্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর:

উদ্দীপনা, অর্ধ-উন্মত্ত, স্থাণু, বধির, অবলুপ্ত, অলৌকিক, সঙ্কীর্ণ, ঘনঘটা, আর্তস্বর।

৬। টীকা লেখ:

কুহেলিকা, বিদ্যুৎ-বহ্নি, জলাশয়, পক্ষাঘাত, চন্দ্রাতপ, কেদারনাথ, পুষ্পবৃষ্টি।



ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

কালিদাস রায়

[কবিশেখর কালিদাস রায় বর্ধমান জেলার কুড়ুই গ্রামে ১৮৯৯-খ্রীস্টাব্দের ৯ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি, সমালোচক, নিবন্ধকার ও শিক্ষক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর কবিতার ক্ষেত্রে সারল্য ও মাধুর্য এবং নিবন্ধের ক্ষেত্রে সহজ-বোধ্যতা ও প্রসাদগুণ হচ্ছে তাঁর লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। ব্রজবেণু, পর্ণপুট, হৈমন্তী ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি পরলোকগমন করেন।]

দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একটা জাতীয়তাবোধের জাগরণ হইল। এই জাতীয়তাবোধ সাধারণতঃ সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া প্রচারিত হইত। এই জাতীয়তাবোধ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় মহা সমিতি বা কংগ্রেসের আকার ধারণ করিল। এই কংগ্রেসের প্রধান ব্রত ছিল—ইংরাজ সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা, সরকারী অবিচার-অনাচারের প্রতিবাদ, জাতির সর্বাধিক অভাব-অভিযোগের আলোচনা এবং দেশশাসনের অংশ ও দায়িত্ব লাভের জন্য দাবি প্রতিষ্ঠা।

ভারতের মধ্যে বাঙ্গালাদেশেই জাতীয়তাবোধ অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিতেছিল ; সেজন্য বাঙালী জাতিকে দুর্বল করিবার জন্য সে সময়ের বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন।

ইহার ফলে বাঙ্গালাদেশে যে আন্দোলন হইল তাহার নাম স্বদেশী

আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার একটি অঙ্গ ছিল বিলাতী পণ্য বর্জন ও স্বদেশী পণ্যের উন্নতি সাধন। দেশময় জাতীয় জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। চারিদিকে সভাসমিতি হইতে লাগিল, উদ্দীপক সাহিত্য ও সঙ্গীতের সৃষ্টি হইল। ইংরাজ সরকার কঠোর হস্তে এই আন্দোলনকে দমন করিতে চেষ্টা করিলেন। তাহার প্রতিক্রিয়ায় একদল যুবক বোমা তৈয়ারী এবং গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকিল। এই যুবক দল ধরা পড়িল এবং তাহাদের কঠোর দণ্ড হইল।

আন্দোলন ইহাতে মন্দীভূত হইল না। তখন সম্রাট পঞ্চম জর্জ আবার দ্বিখণ্ডিত বাঙ্গালাদেশকে পুনর্মিলিত করিয়া দিলেন। আন্দোলন কিন্তু চলিতে লাগিল। ক্রমে বাঙ্গালার আন্দোলন সারা ভারতের আন্দোলন হইয়া উঠিল। এই আন্দোলন মাঝে মাঝে হিংসাত্মক রূপ ধরিত। তখন পর্যন্ত ইহা যথার্থ পথটি ধরিতে পারে নাই।

এমন সময়ে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হইল—এই স্বাধীনতা সংগ্রামে। তিনি বলিলেন—প্রবল ইংরাজ জাতির সহিত সংগ্রামে হিংসার আয়ুধ ব্যর্থ। তিনি অহিংস সত্যাগ্রহের প্রবর্তন করিলেন। দেশবাসী তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল। তাহার পর হইতে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ধারা ভগীরথের শঙ্খধ্বনির অনুসরণে গঙ্গাধারার ন্যায় মহাত্মার নেতৃত্বে চলিতে লাগিল। জাতীয় মহাসমিতির কর্মধারাও মহাত্মার প্রবর্তিত নীতির অনুসরণ করিল।

হাত্মা অহিংস সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ নীতির পুষ্টিসাধনের জন্য যে বিধানগুলির প্রবর্তন করিয়াছিলেন, সেগুলিও স্বাধীনতা সমরের এক একটি আয়ুধ। সেগুলি এই—অহিংসভাবে আইন লঙ্ঘন, বিলাতী পণ্য বর্জন, চরকা ও খদ্দর প্রচার, বিলাসিতা বর্জন, কায়মনোবাক্যে অহিংসাধর্ম পালন, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা বর্জন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতিসাধন,

পতিত, উপেক্ষিত ও হরিজনগণের সমাজে মনুষ্যত্বের মর্যাদাদান, অকাতরে সর্ববিধ লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ বরণ ইত্যাদি। মহাত্মা তামসিকতা আচ্ছন্ন দেশকে সাত্ত্বিকতার পথে স্বাধীনতার সাধনা করিতে শিখাইয়া ছিলেন। তিনি নিজে অশেষ নিগ্রহ লাঞ্ছনা অকাতরে সহ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুবর্তী সাধকগণও দুর্বিষহ নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। ২৫।৩০ বৎসর ধরিয়া এইরূপ কৃচ্ছ্র সাধনের ফলেই আজ আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙ্গালার দান অসামান্য। বাঙ্গালাদেশে মহাত্মার প্রতিনিধি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করিয়া মহাত্মা-প্রবর্তিত আন্দোলনে যোগ দেন, এবং বহুবার কারাবরণ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মহাত্মার অনুবর্তন করিতে পারেন নাই। স্বতন্ত্র একটি দল গঠন করিয়া তিনি অন্য পথে মুক্তির সন্ধান করেন।

সুভাষচন্দ্রের শেষ জীবনের কাহিনী রোমান্টিক নাটকের শেষ অঙ্কের ন্যায় চমকপ্রদ। তিনি যখন আইন লঙ্ঘনের অপরাধে স্বগৃহে নজরবন্দী, তখন মহাযুদ্ধ ভারতের পূর্বদ্বারে আসিয়া পড়িয়াছিল। তিনি এই সুযোগ ছাড়িতে পারিলেন না। তিনি একদিন ছদ্মবেশে কাবুল হইয়া জার্মানীতে পলায়ন করিলেন। পূর্ব-এশিয়া তখন জাপান-অধিকৃত; এই অঞ্চলে যে সকল ভারতীয় প্রবাসী ছিল এবং যে সকল ভারতীয় সৈন্য যুদ্ধ করিতে গিয়া আর দেশে ফিরিতে পারে নাই, তাহাদের লইয়া আজাদ হিন্দ্ ফৌজ নামে একটি বাহিনী গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র হন তাহার নেতা। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এই বাহিনী মণিপুর আক্রমণ করিয়াছিল। আমেরিকানদের আবির্ভাবে ও উপকরণের অভাবে শেষ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ্ ফৌজ আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। সুভাষচন্দ্রের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার এই প্রয়াস স্বাধীনতালাভের পথে আমাদিগকে অনেক দূর আগাইয়া দিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অনুশীলনী

১। 'ভারতের মধ্যে বাঙ্গালাদেশেই জাতীয়তাবোধ অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিতেছিল' —কোন্ সময়ের কথা বলা হয়েছে? জাতীয়তাবোধ অত্যন্ত প্রখর হয়ে ওঠার অব্যবহিত ফলাফল কি হয়েছিল? স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙ্গালার দান সম্বন্ধে কি জান?

২। "এমন সময় মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হইল।"—মহাত্মা গান্ধী কে? কোন্ সময় তাঁর আবির্ভাব হ'ল? ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁর অবদান কি?

৩। "আমেরিকানদের আবির্ভাবে ও উপকরণের অভাবে শেষ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মসমর্পনে বাধ্য হইল।"—আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সম্পর্কে কি জান? আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতা কে? তিনি কিভাবে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী গঠন করেন? এই বাহিনীর অগ্রগতির কাহিনী সম্বন্ধে কি জান?

৪। (ক) বিপরীত শব্দ লিখ:

পূর্বদ্বারে, তামসিক, অসহযোগ, অহিংস, অনুবর্তী, গোপনে।

(খ) অর্থ বল:—শিক্ষা বিস্তার, জাতীয়তা বোধের জাগরণ, কার্য্যকলাপ, অবিচার-অনাচার, অভাব-অভিযোগ, বর্জন, উদ্দীপক, আয়ুধ, কায়মনোবাক্যে, দুর্বিষহ।

(গ) পদ পরিবর্ত্তন কর:—

বিস্তার, প্রচারিত, দুর্বল, বর্জন, সাধণ, উদ্দীপক, সংগ্রহ, লক্ষ্মণ, অসামান্য, প্রবর্তিত।

(ঘ) প্রবন্ধটিতে ব্যবহৃত তৎসম তদ্ভব ও বিদেশী শব্দের দুটি করে উদাহরণ দাও।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসুর অবদানের কথা রচনাটিতে বলা হয়েছে।



[সুসাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটা ছিল ২৪ পরগণা জেলার মজিলপুর গ্রামে। ইনি আধুনিক যুগের একজন শক্তিশালী লেখক। বিশেষতঃ কিশোর সাহিত্য ও অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর উল্লেখযোগ্য অবদান আছে।]

ভারবাহী শেরপাদের বাদ দিয়ে হিমালয়ের এই শেষ অভিযানে কর্ণেল-হাণ্টের নায়কত্বে তেরজন নির্ধারিত পর্বত-আরোহী ছিলেন। এই তের জনের মধ্যে একজন হলেন ভারতীয়—তেনজিং, আর দু'জন হলেন নিউজিল্যাণ্ডবাসী, বাকী সকলেই ইংরেজ। তাঁদের নাম হ'ল, কর্ণেল হাণ্ট (নায়ক), মেজর উইলি, নইস, বুর্দিলো, গ্রেগরী, ব্যান্ড, ইভান্স্, হিলারী, লাওয়ি, ওয়েস্টম্যাকট, ওয়ার্ড, পাফ্, স্টোবার্ট ও তেনজিং।

এভারেস্ট অভিযানের যাত্রাকেন্দ্র হ'ল—নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু। এখানেই নানা দিক থেকে অভিযাত্রীরা সকলে এসে মিলিত হ'ল এবং এখান থেকেই কুলীদেরও সংগ্রহ করা হয়। আগেকার অধিকাংশ অভিযানের মত এই অভিযানও 'আলপাইন ক্লাব' আর ইংলণ্ডের জগৎ-বিখ্যাত 'রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি'র যুক্ত তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়।

ইতিমধ্যেই তেনজিং-এর কাছে আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে গিয়েছিল। তেনজিং-কে বাদ দিয়ে কোন এভারেস্ট অভিযানই গঠিত হতে পারে না। কিন্তু সুইস অভিযান থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তেনজিং অতি কঠিন ম্যালেরিয়া রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁর শরীর রীতিমত দুর্বল হ'য়ে যায়। কিন্তু এভারেস্টের আমন্ত্রণ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেহ-মন

থেকে সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেললেন। ঘরের শান্ত, স্নিগ্ধ, মমতাময় জীবনকে পেছনে ফেলে রেখে তিনি ছুটলেন মৃত্যুসঙ্কুল সেই ভয়ঙ্করের পথে।

কাঠমাণ্ডুতে এসে তেনজিং প্রথমে কর্ণেল হাণ্টকে জানালেন, তিনি এই অভিযানে যোগদান করবার জন্যেই এসেছেন ; কিন্তু তার একটা শর্ত আছে, সে শর্ত মেনে না নিলে তিনি অভিযানে যোগদান করবেন না। সে শর্ত হ'ল, তাঁকে পুরোপুরি অভিযাত্রী ব'লে মেনে নিতে হবে এবং যদি তিনি সক্ষম হন, তাহ'লে তাঁকে একাই এভারেস্টের চূড়ার দিকে অগ্রসর হবার অধিকার দিতে হবে।

কাঠমাণ্ডুর ব্রিটিশ এমবেশীতে এই নিয়ে সভা বসল এবং সভায় স্থির হ'ল, তেনজিং-এর সর্ত স্বীকার করা হবে। তেনজিং আনন্দে অভিযানের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। চারদিক থেকে কুলীরা আসতে লাগল। তেনজিং তার ভেতর থেকে লোক বাছাই করতে লাগলেন।

সমস্ত আয়োজন শেষ হয়ে গেলে, দু'দলে অভিযানকে ভাগ করা হ'ল। প্রথম দলে রইল ন'জন অভিযাত্রী, একশো বাষট্টি জন ভারবাহী আর আঠারো জন শেরপা। দ্বিতীয় দলে রইলেন স্বয়ং কর্ণেল হাণ্ট আর তিন জন অভিযাত্রী, দু'শো জন ভারবাহী আর দু'জন শেরপা। সমস্ত মালের ওজন হ'ল সতেরোশো পাউণ্ড।

কাঠমাণ্ডু থেকে অভিযান যাত্রা করল নামচেবাজারের দিকে—কাঠমাণ্ডু থেকে একশো সত্তর মাইল দূর। এই নামচেবাজার থেকে প্রকৃতপক্ষে শুরু হল আসল অভিযান। এই একশো সত্তর মাইল পথ এত দুরূহ আর দুর্গম যে, অভিজ্ঞ নেপালী শেরপারা ছাড়া এই পথ দিয়ে কেউ অগ্রসর হ'তে পারে না। অন্য পথ দিয়ে অবশ্য নামচেবাজারে পৌঁছানো যায়, কিন্তু তাতে সময় লাগে বেশী।

সাত নম্বর তাঁবু থেকে পথ প্রায় খাড়া সোজা ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে। প্রত্যেক পদে নিজের হাতে বরফ কেটে ধাপ তৈরী ক'রে সেই

খাড়া পথে উঠতে তাঁদের ছু'জনেরই মেরুদণ্ড যেন ভেঙে পড়তে লাগল। তার ওপর তাঁরা ভীত হয়ে দেখলেন, তাঁদের অক্‌সিজেন-যন্ত্রে অক্‌সিজেন প্রয়োজনীয় মাত্রা থেকে অনেক ক'মে গিয়েছে। তখন বাধ্য হয়ে তাঁরা কম মাত্রায় অকসিজেন নিতে লাগলেন।

কিন্তু সেই খাড়া পাহাড়ের গায়ে কোথাও একটা তাঁবু ফেলার মতন সামান্য জায়গাও পাওয়া গেল না। গত বছর তেনজিং সুইস অভিযাত্রীদের সঙ্গে এই পথে এসেছিলেন, সেই সময় তিনি একটা জায়গা লক্ষ্য ক'রে-ছিলেন। বহু খোঁজাখুঁজির পর তেনজিং সেই জায়গা বার করলেন এবং সাতাশ হাজার আটশো ফুটে আট নম্বর তাঁবু ফেলা হ'ল।

এর আগে এত উঁচুতে আর কোনও তাঁবু ফেলা হয়নি। এই তাঁবুতে কোনরকমে একজন মানুষ ধরে। কোন রকম করে তেনজিং আর হিলারী সেই ছোট্ট তাঁবুতে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গে যে সাহায্যকারী দল এসেছিল, তারা ফিরে গেল। তেনজিং আর হিলারী সেই তুষার-নীড়ে কম্পিত বুকে রাত প্রভাতের অপেক্ষায় রইলেন।

উনত্রিশে ভোর ছ'টা বাজতেই তেনজিং আর হিলারী শেষ অভিযানের জন্যে সজ্জিত হ'য়ে বেরিয়ে পড়লেন। ন'টার সময় তাঁরা দক্ষিণ চূড়ায় এসে উঠলেন, যেখান থেকে এভারেস্টের মূল চূড়া হ'ল আর আধ মাইল মাত্র। সেখানে এসে মিনিট দশেক তাঁরা একটু বিশ্রাম ক'রে নিলেন। মুখ থেকে অক্‌সিজেন নেবার মুখোসটা খুলে ফেললেন, দেখলেন বিশেষ কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

অক্‌সিজেন-যন্ত্রের দিকে চেয়ে তাঁরা ভীত হ'য়ে ওঠেন। যেটুকু অক্‌-সিজেন আছে, তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। স্বাভাবিক মাত্রায় যদি নেওয়া হয়, ঢের বেশী।

থায়াংবক থেকে শুরু হয়েছে এভারেস্টের তুষারক্ষেত্র। একটা বিরাট গ্লেসিয়ারের প্রান্তেই থায়াংবক। এইখানে সমস্ত অভিযান তিন সপ্তাহ

অপেক্ষা করে রইল। কারণ এইখানে হিমালয়ের তুহিন-প্রকৃতির সঙ্গে অভিযাত্রীর আর শেরপাদের নিজেদের অভ্যস্ত ক'রে তুলতে হয়। তাছাড়া এইখান থেকেই শুরু হয় পথ-ঘাট জরিপ ক'রে দেখা। নতুন কোন ভাল পথে খুঁজে পাওয়া যায় কি না, সামনের পথের অবস্থা কি রকম, পরবর্তী তাঁবু কোন্ জায়গায় স্থাপন করা সম্ভব হবে, সব এইখান থেকেই নির্ধারিত হয়।

থায়াংবকে এক বৌদ্ধ মঠ আছে। মঠের বৌদ্ধ শ্রমণেরা অভিযাত্রীদের আশীর্বাদ করলেন। থায়াংবক মঠের সামনে থেকেই শুরু হয়েছে বিশাল খুম্বু গ্লেসিয়ার বা হিমবাহ। এই হিমবাহ পেরিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। এইখান থেকেই বাতাস খুব পাতলা হ'য়ে আসে। তাই এখানে কয়েক দিন বাস ক'রে এই পাতলা বাতাসকে সহ্য ক'রে নিতে হয়।

আটাশে তেনজিং আর হিলারী সাত নম্বর তাঁবু থেকে যাত্রা করলেন। তাঁরা ঠিক করলেন, সোজা এভারেস্টের চূড়ার দিকে অগ্রসর না হ'য়ে তাঁরা যত উঁচুতে পারেন, এমনভাবে আট নম্বর তাঁবু ফেলবেন, যাত্রা ক'রে রাত্রির বিশ্রামের পর পরের দিন সকালবেলা তাঁরা শেষ তিনশো কি সাড়ে তিনশো ফুট জয় ক'রে ফিরে আসতে পারেন। এই উচ্চতায় তাঁদের সঙ্গে আর একজন তরুণ শেরপাও এসেছিল,—তার নাম আংগনিমা। তাঁদের দু'জনকে সাহায্য করবার জন্য গ্রেগরী, লাওয়ি আর আংগনিমাকে পাঠান হয়। তা হ'লে চূড়ায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই ফুরিয়ে যাবে, তখন হিসেব ক'রে তাঁরা অক্‌সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দিলেন। তাতে অবশ্য নিশ্বাঃস নিতে একটু অসুবিধা হ'তে লাগল। কিন্তু দুর্জয় পণ যাঁদের মনে, তাঁরা সব অসুবিধার ওপর গিয়ে দাঁড়াতে পারেন।

সেখান থেকে সেই আধমাইল পথ অতিক্রম ক'রতে আড়াই ঘণ্টা লাগল। সাড়ে এগারটার সময় তেনজিং এভেরেস্টের চূড়ায় গিয়ে উঠলেন, তারপর হিলারীকে হাত বাড়িয়ে উপরে তুলে নিলেন। পঞ্চাশ বছর ধরে মানুষের অবিরাম অবিশ্রান্ত সাধনা সেদিন জয়যুক্ত হ'ল।

চূড়ায় পদার্পণ ক'রে তেনজিং নতজানু হয়ে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করলেন —সঙ্গে যে চকোলেট আর বিস্কুট ছিল, তারই অর্ঘ্য মাটিতে রেখে ইষ্টদেবতাকে নিবেদন ক'রলেন। তারপর নেপাল আর ভারতের পতাকা সেখানে পুঁতলেন। ভারতের পতাকা তাঁকে কোন ভারতীয় নেতা বা ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দেন নি, তাঁর এক বাঙালী বন্ধু একটি ছোট ত্রিবর্ণ পতাকা তাঁর হাতে দেন। বন্ধুর দেওয়া সেই ছোট্ট পতাকাটুকু রাখল ভারত-রাষ্ট্রের সম্মান।

অনুশীলনী

১। শব্দার্থ বল ও বাক্যরচনা কর :—
শেরপা, গ্লেসিয়ার, জরিপ, তুহিন, মৃত্যুসঙ্কুল, ভারবাহী, অভিযান।

২। এভারেস্ট বিজয়ের কাহিনীটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় বিবৃত কর।

৩। তেনজিং ও তাঁর সঙ্গীরা অভিযানের সময় কি কি অসুবিধা ভোগ করেন?

৪। (ক) শৃঙ্গারোহণের পর তেনজিং কি করেন?
(খ) শৃঙ্গারোহণের কি শর্ত তেনজিং দিয়েছিলেন?

৫। (ক) এভারেস্ট শৃঙ্গে প্রথম কে আরোহণ করেন?
(খ) অভিযাত্রী দলের নেতা কে ছিলেন?
(গ) তেনজিংকে জাতীয় পতাকা কে দেন?

———

আলোচ্য অভিযান মূলক রচনাটি তেনজিং ও হিলারীর বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গ এভারেস্ট বিজয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

একাগ্রতা

কাশীরাম দাস

[আনুমানিক ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে মহাকবি কাশীরাম দাস জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা মহাকাব্যে কাশীরাম দাস রচিত **'মহাভারত'** নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে তার আসন আজও অবধি অটল রেখেছে।]

তবে কতদিনে দ্রোণ বিদ্যা পরীক্ষিতে।
রচিয়া কাষ্ঠের পক্ষী রাখিলা বৃক্ষেতে॥
একে একে ডাকিলা যতেক শিষ্যগণে।
আগে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্মের নন্দনে॥
ধনুঃশর দিল দ্রোণ যুধিষ্ঠির করে।
ভাসপক্ষী দেখাইয়া কহেন তাহারে॥
ওই দেখো ভাসপক্ষী বৃক্ষের উপর।
উহারে করিয়া লক্ষ্য রাখো, ধনুঃশর॥
যেইক্ষণে মমমুখে হইবে বাহির।
না স্ফূরিতে বাক্য কাটি পাড়ো পক্ষিশির॥
এতশুনি শর যুড়ি রহে পাণ্ডুপতি।
ক্ষণেক থামিয়া রৈল দ্রোণ মহামতি॥
ডাকিয়া বলিল দ্রোণ কুন্তীর কুমারে।
কোন্ কোন্ জনে তুমি পাও দেখিবারে?
ধর্ম বলে ভাস দেখি বৃক্ষের উপর।
ভূমিতলে আছে দেখি যত সহোদর॥

এতশুনি দ্রোণ তাঁরে অনেক নিন্দিয়া।
ছাড়ো ছাড়ো বলি ধনু লইলা কাড়িয়া॥
দুর্যোধন শত ভাই বীর বৃকোদর।
একে একে সবারে দিলেন ধনুঃশর॥
যেইরূপ কহিলেন ধর্মের নন্দন।
সেইমত কহিল সকল ভ্রাতৃগণ॥
সবাকারে বহুনিন্দা করি দ্রোণবীর।
ধনু লইয়া ঢেকা মারি করেন বাহির॥
ধনুঃশর দিলা গুরু অর্জুনের হাতে।
ভাস দেখাইয়া দিল বৃক্ষের অগ্রেতে॥
নির্গত হইবে সবে মোর মুখে বাণী।
নিঃশব্দে শূন্যেতে পাড়ো পক্ষিশির হানি॥
গুরুবাক্যে পার্থবীর টানে ধনুগুর্ণ।
পক্ষে একদৃষ্টি করি রহিলা অর্জুন॥
কতক্ষণ থাকি দ্রোণ বলিলা অর্জুনে।
কোন্ কোন্ জনে তুমি দেখহ নয়নে?
পার্থ বলে আমি কিছু অন্য নাহি দেখি।
বৃক্ষ উপরেতে দেখিবারে পাই পাখি॥
হৃষ্ট হইয়া দ্রোণ পুনঃ কৈল কতক্ষণে।
কিরূপ ভাসে অঙ্গ কহ মোর স্থানে।
অর্জুন বলেন আর ভাস নাহি দেখি।
শিরস্থানে পক্ষীর দেখিয়ে দুই আঁখি॥
দ্রোণ বলে মারো অস্ত্র কাটো পক্ষিশির।
না স্ফূরিতে বাক্যমাত্র কাটে পার্থবীর॥

অনুশীলনী

১। একাগ্রতার কি কাহিনী এই কবিতাটিতে বর্ণনা করা হয়েছে নিজের ভাষায় লেখ।

২। 'সবাকারে বহু নিন্দা করি দ্রোণবীর।
ধনু লইয়া ঢেকা মারি করেন বাহির॥'

'দ্রোণবীরে'র এরূপ করার কারণ কি? তারপর তিনি কি করলেন? এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল?

৩। অর্জুনের সাফল্যের কারণ কি?

৪। সেইরূপ কহিলেন ধর্মের নন্দন
সেইমত কহিল সকল ভ্রাতৃগণ॥

ধর্মের নন্দন কে? তিনি তার কোন প্রশ্নের উত্তরে কি বলেছিলেন? তাঁর অন্যান্য সহোদরের নাম বল। তাঁর সকল ভাই কি তাঁর মত আচরণ করে ছিলেন—না এ বিষয়ে কাহারও আচরণে ব্যতিক্রম ছিল?

৫। অর্জুন বলেন আর ভাস নাহি দেখি
শিরস্থানে পক্ষীর দেখয়ে দুই আঁখি॥
দ্রোণ বলে মারো অস্ত্র কাটো পক্ষিশির।
না স্ফুরিতে বাক্যমান কাটে পার্থবীর।

উদ্ধৃত অংশটি কোন কবিতা হ'তে গৃহীত? কবির নাম বল। অংশটি মূল কোন কাব্যের? ভাস কি? লক্ষ্যভেদ কালে অর্জুনের দৃষ্টি কিরূপ হয়েছিল?

৬। (ক) শব্দার্থ লেখ ও বাক্যরচনা কর:
স্ফুরিতে, একাগ্রতা, বৃকোদর, মুণ্ড, ধনুর্গুণ।
(খ) শব্দগুলির গদ্যরূপ লেখ:
পরীক্ষিতে ডাকিলা, যুড়ি, রৈল, দেখহ, লৈয়া।

অর্জুনের লক্ষ্যভেদের কাহিনী কবিতাটি
কবি ২৬২৬২।

দেবী সমীপে পশুদের নিবেদন

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

[ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর আদি বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে। মুসলমান শাসকের উৎপীড়নে কবিকে পৈত্রিক নিবাস পরিত্যাগ করে মেদিনীপুরের আরড়া গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। মুকুন্দরাম মধ্যযুগের একজন বিশিষ্ট শক্তিশালী কবি। তাঁহার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'কবি-কঙ্কণ চণ্ডী' হইতে এই অংশ সংকলিত।]

চণ্ডী জিজ্ঞাসেন পশুগণে।
একা বীর কালকেতু সবার বধের হেতু।
শুনিতে কৌতুক বড় মনে॥
কহে বীর মৃগরাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ
কালকেতু ভাঙ্গিল দশন।
কৃপা কর কৃপাময়ি তোমায় বাহন হই
জীবনে নাহিক প্রয়োজন॥
বাঘিনীর শুন কথা কালকেতু দিল ব্যথা
স্বামীরে বধিল একবাণে।
দুইটি আছিল পো তারে বড় মায়া মো
কালকেতু বধিল পরাণে॥
কান্দিয়া মহিষ কয় নিবেদিত করি ভয়
কালকেতু লাগিল বিবাদে।
হইগো তোমার দাস বনে খাই পাণী ঘাস
বধ করে বিনি অপরাধে॥

ভূমে লোটাইয়া মাথা কহে গজ দুঃখ কথা
দন্ত দুটা হইল নাশ হেতু ।
এক বাণে করে অন্ত টাঙ্গী দিয়া কাটে দন্ত
হাটে লয়্যা বেচে কালকেতু ॥
নিবেদন করে গণ্ডা কারে নাহি করি খাণ্ডা
বনমাঝে করি গো নিবাস ।
কার হিংসা নাহি করি কালকেতু হৈল অরি
অনুদিন পাইগো তরাস ॥
কপি বলে শুন মা আমার যতেক ছা
সবারে বেচিল মহাবীর ।
হেন মোর করে মন হারায়ে জীবন-ধন
প্রাণ দিব প্রবেশিয়া নীর ॥
মৃগ আদি পশুগণ সবে কৈল নিবেদন
অভয় দিলেন মহামায়া ।
ব্রাহ্মণ-ভূমের প্রতি রঘুনাথ নরপতি
জয়চণ্ডী তারে কর দয়া ॥

অনুশীলনী

১। চণ্ডীর নিকটে পশুদের দুঃখ নিবেদনের কারণ কি? তাদের দুঃখের কাহিনী নিজের ভাষায় লেখ।

২। 'মৃগ আদি পশুগণ সবে কৈল নিবেদন
অভয় দিলেন মহামায়া।'

এই অংশ কোন্ কবিতা থেকে উদ্ধৃত? মূল কাব্যগ্রন্থের নাম কি? মহামায়ার অভয়দানের কারণ কি?

৩। অর্থ লেখ ও স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ
মৃগরাজ, দুঃখকথা, জীবনধন, চণ্ডী, অরি, মহাবীর, টাঙ্গী, বনমাঝে।

৪। টীকা লেখ ঃ—
চণ্ডী, কালকেতু, রঘুনাথ, মহাবীর।

৫। কবিতাটির সারমর্ম ও মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লেখ।

[illegible] দেবী চণ্ডীর নিকট পশুদের
দুঃখের [illegible]



বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাসাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন তিনিই করেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ ও নাটকগুলির মধ্যে 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'বীরাঙ্গনা', 'শর্মিষ্ঠা', 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলাসাহিত্যে অমর হয়ে আছে। কবি শেষজীবনে দীর্ঘ রোগভোগের পর হাসপাতালে মারা যান।]

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি',
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি'
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়মন ;
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি' ;—
কেলিনু শৈবালে ভুলি' কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি !
যা ফিরি', অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি' ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

অনুশীলনী

১। (ক) 'তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি'—কবি কাকে অবহেলা করেছেন? কিভাবে তিনি অবহেলা করেন?

(খ) কবি বঙ্গের রত্ন ভাণ্ডারকে অবহেলা করে কি করেছিলেন? কিরূপে তাঁর মতি পরিবর্তন হলো এর ফলে তিনি কি লাভ করলেন?

২। 'যা ফিরি', অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি' ঘরে।'—কে এই উক্তি করেন? কাকে উদ্দেশ্য করে এই উক্তি করা হয়? 'ঘরে ফেরা' বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

৩। (ক) "মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি';—
কেলিনু শৈবালে ভুলি' কমল-কানন।"

—অংশটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত? কবির নাম বল।" 'বিফল তপ' বলতে কবি কি বুঝাতে চেয়েছেন? 'অবরেণ্যে বরি' কথাটি কবি ব্যবহার করেছেন কেন? 'শৈবাল' ও 'কমল-কাননের' তুলনাটি বুঝায়ে লিখ।

(খ) "পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে"—এই অংশবিশেষ কোন্ কবিতা হতে উৎকলিত? বর্তমান অংশটির মূলকথা লিখ।

৪। শব্দার্থ লেখ ও স্বরচিত কাব্যে প্রয়োগ কর:
কমল-কানন, কুল-লক্ষ্মী, মণিজালে, মাতৃভাষা, কুক্ষণে, ভিক্ষাবৃত্তি।

৫। গদ্যরূপ লেখ:
কাটাইনু, আচরি, সঁপি, বরি'।

অতীতে ইংরেজীতে কাব্য রচনা করে যশস্বী হওয়ার চেষ্টায় নিমগ্ন থাকার জন্য নিজেকে ধিক্কার জানান। আলোচ্য কবিতাটিতে কবি বাংলা ভাষার গৌরব কীর্তন করেছেন।

অন্ধ কবি



হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[হুগলী জেলার রাজবলহাট গ্রামে ১২৩১ সালে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'চিন্তা-তরঙ্গিণী' 'বৃত্রসংহার কাব্য', 'বীরবাহু কাব্য', 'ছায়াময়ী' প্রভৃতি।

দৃষ্টিহীন অবস্থায় ১৩১০ বঙ্গাব্দে কবি দেহত্যাগ করেন।]

একটি কুঠারাঘাত শিরে হানি অকস্মাৎ
ঘুচাইলে ভবের স্বপন ;
সব আশা চূর্ণ ক'রে রাখিলে অবনী 'পরে
চিরদিন করিতে ক্রন্দন।
সব ঘুচাইলে বিধি হ'রে নিয়ে চক্ষুনিধি
অন্ধকারে ডুবালে অবনী,
না পাব দেখিতে আর এ ভবের শ্রীভাণ্ডার
চির-অস্তমিত দিনমণি।
প্রতিদিন অংশুমালী সহস্র কিরণ ঢালি
পুলকিত করিবে সকলে,
আমার রজনী শেষ হবে নাকি ? হে ভবেশ,
জানিব না দিবা কারে বলে ?
আর না সুধার সিন্ধু আকাশে দেখিব ইন্দু,
প্রাতে চারু শিশিরের কণা,
অপূর্ব ভবের চিত্র থাকিবে স্মরণে মাত্র,
স্বপ্নবৎ মায়ার কল্পনা !

কি নিয়ে থাকিব ভবে ? কি সাধনা সিদ্ধ হ'বে ?
ভবলীলা ঘুচেছে আমার।
জীবনের শেষকালে সকলি হরিয়ে নিলে,
প্রাণ নিয়ে দুঃখে কর পার।

অনুশীলনী

১। ঈশ্বরের কাছে কবির বেদনার কথা কবিতায় যেভাবে পড়েছ, নিজের ভাষায় লেখ।

২। 'অপূর্ব ভবের চিত্র থাকিবে স্মরণে মাত্র,
স্বপ্নবৎ মায়ার কল্পনা !'

—উক্তিটি কার ? অপূর্ব চিত্রগুলি কি কি ? এই চিত্রগুলি 'স্বপ্নবৎ মায়ার কল্পনা' হবে কেন ?

৩। ব্যাখ্যা কর :

(ক) 'সব ঘুচাইলে……চির-অস্তমিত দিনমণি।'

—অংশটি কোন্ কবিতার অন্তর্গত ? উদ্ধৃতিটির প্রসঙ্গ উল্লেখ কর। 'দিনমণি' শব্দের অর্থ কি ? দিনমণি চির-অস্তমিত কেন ? এই অংশে কবির কি মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ?

(খ) আর না সুধার সিন্ধু……মায়ার কল্পনা !

—পংক্তি দুইটি কোন্ কবিতা হতে গৃহীত হয়েছে ? বর্তমান অংশটি প্রসঙ্গ উল্লেখ কর। অংশটির মূল বক্তব্য বুঝাইয়া দাও।

৪। ঈশ্বরের কাছে কবির শেষ প্রার্থনা কি ?

৫। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যরচনা কর :

কুঠারাঘাত, স্বপন, চক্ষুনিধি, সুধা, ভবেশ, চারু, ভবলীলা।

৬। সমার্থক শব্দ লেখ :

অন্ধকার, দিনমণি, অংশুমালী, অবনী, রজনী, ইন্দু।

———

ঈশ্বরের কাছে ... কবি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে

স্বাধীনতা



রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

[বাংলা সাহিত্যে কবিতায় দেশাত্মবোধের উন্মেষ করেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)। কবি ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন। কবির উল্লেখযোগ্য কাব্য ও সাহিত্যগ্রন্থগুলি : 'কর্মদেবী', 'পদ্মিনী', 'শূরসুন্দরী'। মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব'-এর অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও 'বাঙ্গলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' লিখে বাংলা ভাষায় তুলনামূলক কাব্য সমালোচনার ভিত্তি স্থাপন করেন।]

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল' কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়।
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার,
আত্মনাশে যে করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার।
অতএব রণভূমে চলো ত্বরা যাই হে,
চলো ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই॥

অনুশীলনী

১। 'স্বাধীনতা' কবিতাটিতে কবির দেশাত্মবোধের কি পরিচয় পাও ?

২। 'দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই।'

—এই লাইন ক'টি কোন্ কবিতা হইতে উদ্ধৃত ? কবি কেন একথা বলেছেন ? দেশহিতে মৃত্যুবরণ করেছেন এরূপ দুইজনের নাম বল।

৩। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যরচনা কর :

স্বাধীনতা, দাসত্ব-শৃঙ্খল, রাজপুতনা, আত্মনাশ, স্বর্গসুখ, রণভূমে, দেশহিতে।

৪। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :

নরক, সার্থক, স্বাধীনতা।

৫। টীকা লেখ :

কোটিকল্প, স্বর্গসুখ, দাসত্ব-শৃঙ্খল।

৬। ব্যাখ্যা কর :

(ক) সার্থক জীবন……দেশের উদ্ধার।

—উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতার ? কবির নাম কি ? 'আত্মনাশে যে করে দেশের উদ্ধার' অংশটির মূলকথা বর্ণনা কর।

(খ) অতএব রণভূমে……তুল্য তার নাই !

—কোন্ কবিতা থেকে অংশটি উদ্ধৃত ? কোন্ প্রসঙ্গে বর্তমান উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে ? কবি রণভূমিতে যেতে ইচ্ছা করেছেন কেন ?

কবিতাটিতে কবি দেশাত্মবোধ
জাগ্রত হওয়ার কথা বলেছেন।



প্রার্থনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বাংলা ১১৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ-ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির সারাজীবন সাহিত্য-সাধনায় নিবেদিত হয়েছে। শেষ জীবনে শান্তিনিকেতনে নালন্দা বিহারের বিশ্ববিদ্যা-লয়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয় আদর্শে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বিশ্বভারতী। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় রবীন্দ্রনাথের অবদান বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালীকে তাঁর কাছে ঋণী করে রেখেছে।]

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়॥
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে—
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়॥
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা—
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

আমার ভার লাঘব করি
নাইবা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয় ॥
নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে—
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয় ॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম লেখ।

২। (ক) "বিপদে……করি ভয়।"

উদ্ধৃতিটি কোন্ কবির কোন্ কবিতার অন্তর্গত? কবি কাহার নিকট কি প্রার্থনা করিতেছেন? 'বিপদে' বলিতে কবি কি বুঝাইয়াছেন?

(খ) "সংসারেতে……মানি ক্ষয়।"

উদ্ধৃতিটুকু কোন্ কবিতার অন্তর্গত? অংশটির মূল তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও। নিম্নরেখ কথাটির দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

অংশে 'নিম্নরেখ' 'নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়'।

(গ) "দুঃখের রাতে…… সংশয়।"

বর্তমান অংশে উদ্ধৃত 'দুখের রাত', 'নিখিল ধরা' বলিতে কি বুঝিয়েছেন, উদ্ধৃত অংশে কবির কোন্ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে?

৩। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যরচনা কর:

প্রার্থনা, বঞ্চনা, ত্রাণ, লাঘব, নিখিল, নম্র, সংশয়।

৪। শব্দগুলির গদ্যরূপ লেখ:

শকতি, তরিতে, টুটে।



খেয়া ডিঙি

যতীন্দ্র মোহন বাগচী

[যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী (১৮৭৮ খ্রীঃ ২৭শে নভেম্বর—১৯৪৬ খ্রীঃ, ১লা ফেব্রুয়ারী) নদীয়া জেলার জামসেদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই কবি তাঁর কাব্যে অনুরাগের পরিচয় দেন। কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ—'মহাভারতী', 'কাব্যমালঞ্চ', 'অপরাজিতা', 'নীহারিকা' প্রভৃতি। যতীন্দ্রমোহন 'পূর্বাঞ্চল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।]

পাটের ক্ষেতের ভিতর দিয়া ঘাটের ডিঙ্গা বাই—
তবু আমার হাটের সাথে কোনও বাঁধন নাই ;
শিরা-ওঠা-ফাটা হাতে হালের গোড়া ধরি,
আমি শুধু আপন মনে এপার-ওপার করি।

তোমরা ভাবো—ক্ষেত আর ফসল, বৃষ্টি বাদল বান,
ডুবল কত বাঁচল কত ভরা ভাদুই ধান,
আমার কিন্তু সে সব দিকে খেয়াল খবর নাই—
আমি আমার নিয়ম মতন ঘাটের ডিঙা বাই।

ভাদর আসে মরা গাঙে ভরা বন্যা নিয়ে—
রাঙা জলে এপার-ওপার একসা করে দিয়ে ;
লগির গোড়া পায় না তলা, মিলে না আর থই
দিনে রাতে তবু আমার কাজের ছুটি কই।

হঠাৎ যেদিন বানের জলে ছাপিয়ে উঠে মাঠ
হাঁটু-নাগাল ধানের জমি গলা-নাগাল পাট,

কানাকানি বানের জলে ধানের আগা দোলে
টল্‌মলিয়ে ডিঙা আমার চলে তারি কোলে।

কোথায় বা সে আলোর রেখা, কোথায় বা সে বাঁধ
বাবলা গাছের বেড়া নিয়ে কোথায় বা বিবাদ।
বাঁধন-হারা বানের মুখে বিধি-বিধান নাই—
সীমাবিহীন পাড়ার ক্ষেতে ঘাটের ডিঙা বাই।

কোমর-জলে দাঁড়িয়ে ক'ষে কাস্তে চালায় চাষী
ধানের শিষের সোঁদা গন্ধ হাওয়ায় বেড়ায় ভাসি,
কাজল-কাটা ধানের ডগা নুইয়ে জলের তলে
ঘস্‌ঘসিয়ে তারি মাঝে ডিঙা আমার চলে।

আঁটি বাঁধা ধানের রাশি এপার-ওপার করি
পাল বাঁধা পাটের গাদা বোঝাই ক'রে মরি ;
দিনে রাতে বড় লোকের কত কথাই শুনি—
আমি বসে আপন মনে খেয়ার হিসাব গুণি।

জলের গায়ে সিঁদুর ঢেলে সূয্যি উঠে পূবে
দিনের খেয়া সেরে আবার পশ্চিমেতে ডুবে ;
বারো মাসে একটি দিনও ছুটি কামাই নাই ;
তারি সাথে আমি আমার ঘাটের ডিঙা বাই।

অনুশীলনী

১। "তোমরা ভাবো·······ডিঙা বাই"।

বক্তা কে? তোমরা বলিতে বক্তা কাহাদের বুঝিয়েছেন? তারা কি ভাবে? ভাতুই ধান কি? বক্তার কোনোদিকে খেয়াল খবর নাই কেন?

২। "হঠাৎ যেদিন বানের······তারি কোলে।"

উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতার? কবির নাম বল। 'হাঁটু নাগাল ধানের জমি', 'গলা নাগাল পাট' বলিতে কি বুঝ? 'ধানের আশা' বলিতে কবি কি বুঝাইয়াছেন?

৩। 'দিনে রাতে বড় লোকের কত কথাই শুনি
আমি বসে আপন মনে খেয়ার হিসাব গুণি'

—কে এই কথা বলেছেন? 'বড়লোক' কথাটি কোন্ অর্থে এখানে প্রযুক্ত হয়েছে? খেয়ার হিসাব' বলিতে কবি কি বুঝিয়েছেন?

৪। 'বার মাসে একটি দিনও ছুটি কামাই নাই'।

বক্তা কে? বক্তার বারমাসের একটি দিনেও ছুটি কামাই নাই কেন?

৫। অর্থ বল:

বাদল, ডিঙা, ভাদুই, গাঙ্, বিধি-বিধান।

৬। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ:

রাত, এপার, পূব, গোড়া।

৭। (ক) বাক্য রচনা:

ডিঙ্গা, খেয়াল, এক্‌সা, ছাপিয়ে, কানাকানি, টল্‌মলিয়ে, ঘস্‌ঘসিয়ে,

(খ) গদ্য রূপ দাও:—

বাই, নিয়ে, দিয়ে, বুনি,

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর:

জলের গায়ে—ঢেলে সূর্যি উঠে—দিনের খেয়া সেরে—আবার—ডুবে—মাসের একটি দিনও নাই—তারি——আমি আমায়—ডিঙ্গা বাই।

কবিতাটিতে একমাঝির বর্ণনায়
জীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।



জাতির পাঁতি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) আদি বাসভূমি বর্ধমান জেলার চুপী গ্রামে। শব্দনির্বাচনে ও ছন্দের নৈপুণ্যে তিনি সমসাময়িক কবিদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের দাবী করেন। 'তীর্থ-সলিল.' 'অভ্র আবীর,' 'কুহু ও কেকা' ইত্যাদি কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।]

জগৎ জুড়িয়া একজাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ-জাতি,
এক পৃথিবীর স্তন্যে পালিত, একই রবি শশী মোদের সাথী।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচা গুলি ডাঁটো করে তুলি, বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো, জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবারি সমান রাঙা।
বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ ভিতরের রঙ পলকে ফোটে,
বামুন, শুদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র, কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে।
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে, আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে পাইরে বিশেষ, নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।
সেবার ব্রতে যে সবাই লেগেছে, লাগিছে লাগিবে দু'দিন পরে,
মহামানবের পূজার লাগিয়া সবাই অর্ঘ্য রচনা করে।
মালাকার তাঁর মাল্য জোগায়, গন্ধ বেনেরা গন্ধ আনে,
চাষী উপবাসী থাকিতে না দেয়, নট তাঁরে তোষে নৃত্যে গানে।
স্বর্ণকারেরা ভূষিছে সোনায়, গোয়ালা জোগায় ছানা ও ননী,
তাঁতীরা সাজায় চন্দ্রকোণায়, বণিকেরা তাঁরে করিছে ধনী।

যোদ্ধারা তাঁরে সাঁজোয়া পরায় বিদ্বান্ তাঁর ফোটায় আঁখি,
জ্ঞান অঞ্জন নিত্য জোগায় কিছু যেন জানা না রয় বাকি।
কেউ হেয় নাই, সমান সবাই, আদি জননীর পুত্র সবে,
মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল, জাতির তর্ক কেন গো তবে ?
তরুণ যুগের অরুণ প্রভাতে মহামানবের গাহি রে জয়,
বর্ণে বর্ণে নাহিক বিশেষ, নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।

অনুশীলনী

১। 'জাতির পাঁতি' শব্দের অর্থ কি ? কবিতাটি পড়ে কবির বক্তব্য দশটি বাক্যের মধ্যে লেখ।

২। 'জগৎ জুড়িয়া একজাতি আছে সে জাতির নাম মানুষ জাতি'। উদাহরণ ও বক্তব্যের সাহায্যে উপরের পংক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৩। 'কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো করে তুলি'—'কচি কাঁচাগুলি' বলতে কবি কাদের উল্লেখ করেছেন ? ডাঁটো করে তোলার অর্থ কি ?

৪। "মিছে কোলাহল বাড়ায়ে কি ফল, জাতির তর্ক কেন গো তবে ?" 'মিছে কোলাহল' কি ? কবি কি মীমাংসা সূত্রের কথা বলেছেন ?

৫। (ক) 'কালো আর ধলো বাহিরে কেবল, ভিতরে সবাই সমান রাঙা'—অংশটি কোন্ কবিতা হইতে গৃহীত হয়েছে ? অংশটির প্রসঙ্গ আলোচনা কর। পংক্তিটি পড়ে যা বুঝেছ নিজের কথায় লেখ।

(খ) "তরুণ যুগের...... ব্রহ্মময়।"

উদ্ধৃত অংশ কোন্ কবিতা হইতে উৎকলিত ? কবির নাম বল। বর্তমান অংশটির মূলকথা নিজের কথায় লেখ। 'তরুণ যুগ' বলতে কবি কোন্ যুগের কথা বলেছেন ?

৬। শব্দার্থ লেখ :

কৃত্রিম, নিখিল, সাঁজোয়া, অঞ্জন, ভুবন।

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) বাহিরের ছোপ——ধুলায় লোটে।

(খ) রাগে অনুরাগে——জগৎ ব্রহ্মময়।

৮। এই কবিতায় কতগুলি বিপরীত শব্দ পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়েছে ?

———

কবিতাটি কবি বিষ্ণুসানবাজাব ... লিখেছেন।

একুশে আইন

সুকুমার রায়

[সুকুমার রায়ের (১৮৮৭-১৯২৩) আবোল-তাবোলের পরিচয় কে না জানে। এই কবিতাটি আবোল-তাবোল থেকেই নেওয়া। পড়লে বুঝতে পারবে কবিতাটি কিন্তু নেহাতই আবোল-তাবোল নয় ; নিয়মশৃঙ্খলা অহেতুক, অনর্থক কাঠিন্যকে ব্যঙ্গ করেছেন তিনি। এমনই তাঁর ক্ষমতা ছিল অনাবিল হাসির মোড়কে গুরুগম্ভীর বিষয়কে পরিবেশন করার। আর একটা কথা জান কি—লেখা ছাড়া শিল্পে ও মুদ্রণ শিল্পে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল।]

শিবঠাকুরের আপন দেশে,
আইন কানুন সর্বনেশে।
কেউ যদি যায় পিছলে পড়ে
প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে,
কাজির কাছে হয় বিচার—
একুশ টাকা দণ্ড তার
সেথায় সন্ধে ছ'টার আগে,
হাঁচতে হলে টিকিট লাগে ;
হাঁচলে পরে বিন্ টিকিটে—
দম্‌দমাদম্ লাগায় পিঠে,
কোটাল এসে নস্যি ঝাড়ে—
একুশ দফা হাঁচিয়ে মারে ॥
কারুর যদি দাঁতটি নড়ে,
চারটি টাকা মাশুল ধরে,
কারুর যদি গোঁফ গজায়,
একশো আনা ট্যাকস চায়,—

খুঁচিয়ে পিঠে গুঁজিয়ে ঘাড়,
সেলাম ঠোকায় একুশ বার ॥
চলতে গিয়ে কেউ যদি চায়,
এদিক ওদিক ডাইনে বাঁয়,
রাজার কাছে খবর ছোটে,
পল্টনেরা লাফিয়ে ওঠে,
দুপুর রোদে ঘামিয়ে তায়
একুশ হাত জল গেলায় ॥

* * *

হঠাৎ সেথা রাত দুপুরে
নাক ডাকলে ঘুমের ঘোরে,
অমনি তেড়ে মাথায় ঘষে,
গোবর গুলে বেলের কষে,
একুশটি পাক ঘুরিয়ে তাকে
একুশ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখে ॥

অনুশীলনী

১। 'কবিতাটি নিছক হাসির কবিতা নয়—কবি হাসির ভেতর দিয়ে আরো কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন।'—তোমার কি মনে হয় এই বক্তব্য সত্য ?

২। 'শিবঠাকুরের আপন দেশে ;
আইনকানুন সর্বনেশে।'

শিবঠাকুর কে ? কোন্ আইনকানুনের কথা বলা হয়েছে ? আইনগুলি 'সর্বনেশে' কেন ?

৩। কোন্ কোন্ অপরাধে কি কি ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

৪। 'কবিতাটিতে কবি ইংরেজ শাসনের আইন-প্রণয়নের কথাই বলেছেন'—তোমাদের কি মনে হয় ? এরূপ একটি আইনের কথা বল।

৫। শব্দার্থ লেখ ও ঐ শব্দগুলি দিয়ে নিজে বাক্যরচনা কর :
আইনকানুন, প্যায়দা, কাজি, কোটাল. মাশুল, পল্টন।

এই কবিতায় কবি ইংরেজ
শাসন সম্পর্কে ব্যঙ্গ করেছেন।



আমাদের দাবী

সুনির্মল বসু

[কবি সুনির্মল বসু (১৯০৮-১৯৫৭) কিশোরদের প্রিয় কবি। শিশু ও কিশোরদের জন্য কবিতা ও গল্প রচনা করেন। বাংলা ভাষায় শিশুসাহিত্যে মনোযোগী সাহিত্যিকদের মধ্যে সুনির্মল বসু অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন। ছোটদের রামায়ণ ও মহাভারত, সরস কবিতা স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধ ও রচনা কবির রচনাসম্ভারকে সমৃদ্ধ করেছে।)

আমরা কিশোর, আমাদের দাবী সামান্য অতিশয়,
চিরদিন ধ'রে ক্ষতি সহিয়াছি, আর কত ক্ষতি সয়?
নগণ্য মোরা নই,
অগণ্য এই কিশোর আমরা কত মুখ বুজে রই?
আমরা জানাবো আমাদের দাবী অভাবিত ঘোষণায়,
কঠোর কণ্ঠে জানাবো মোদের অধিকার দুনিয়ায়।
আমরা বাঁচিতে চাই,
কে বাঁচিবে বলো, স্বাধীন মাটিতে মোরা যদি মরে যাই?
বিরাট কিশোর-রাজ্যের মাঝে আমরা অধীশ্বর,
সবাই সেথায় পবিত্রতায় অপূর্ব সুন্দর,
নির্মল, নিষ্পাপ,
মোদের রাজ্যে লাগিবেনা কভু বিধাতার অভিশাপ।
শিশু ও কিশোর জাতির মজ্জা, মর্য্যাদা নাহি পায়,
অমানুষ হয়ে তারা যদি রয়, দেশ যাবে গোল্লায়,
দাবী করি বার বার—
আনবিক নয়, চাই শুধু মোরা মানবিক অধিকার।

অনুশীলনী

১। 'আমাদের দাবী সামান্য অতিশয়'—কাদের দাবীর কথা বলা হয়েছে? এই সামান্য দাবীগুলি কি? এই লাইনটি কোন্ কবিতা হ'তে উদ্ধৃত?

২। 'মোদের রাজ্যে লাগিবে না কভু বিধাতার অভিশাপ'—কাদের রাজ্যের কথা বলা হয়েছে? এই রাজ্যে কেন বিধাতার অভিশাপ পড়বে না?

৩। "শিশু ও কিশোর···মানবিক অধিকার।"

কোন্ কবির কোন্ কবিতা হতে অংশটি উৎকলিত? শিশু ও কিশোরকে জাতির মজ্জা বলা হয়েছে কেন? 'দেশ যাবে গোল্লায়' কথাটির মূলগত অর্থ কি? মানবিক অধিকার বলিতে কি বোঝ? 'আনবিক' শব্দের অর্থ কি?

৪। শব্দার্থ লেখ ও বাক্যরচনা কর:

কিশোর, নগণ্য, অভাবিত, অধীশ্বর, নির্মল, মজ্জা, আনবিক।

৫। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ:

বিরাট, সুন্দর, কঠোর, স্বাধীন।

৬। পদান্তর কর—

কিশোর, আনবিক, অতিশয়, সুন্দর, অভিশাপ।

৭। সন্ধি বিচ্ছেদ কর:—

নির্মল, নিষ্পাপ, অভাবিত।

৮। মৌখিক প্রশ্ন:—

(ক) কিশোর কারা?

(খ) দুনিয়া বলতে কি বুঝ?

(গ) স্বাধীন মাটিতে বলতে কি বুঝ?

(ঘ) "মোদের রাজ্যে লাগিবেনা না কভু বিধতার অভিশাপ" পংক্তিটির অর্থ বল।

কবিতাটিতে কিশোর সম্প্রদায় নিজেদের মানবিক অধিকার সম্পর্কে দাবী জানিয়েছে।



কুলি মজুর

কাজী নজরুল ইসলাম

[বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬) খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম যৌবনে সৈনিক হিসাবে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দেন। বাংলা কবিতায় প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব্বে বৈপ্লবিক চেতনা জাগরণের মহান্ ব্রতে সাহিত্যকে তিনি যথাযথভাবে ব্যবহার করেন। ইঁহার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সঞ্চিতা', 'দোলন চাঁপা' প্রভৃতি স্মরণীয়। কবি-রচিত সঙ্গীত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।]

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবুসাব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে'—
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল !
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প শকট চলে।
বাবুসাব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে—
বেতন দিয়াছ ? চুপরও যত মিথ্যাবাদির দল,
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোড় পেলি বল্ ?
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বলো ত এসব কাহাদের দান ? তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা ?—ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জাননা কি কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ ঐ জাহাজ শকট অট্টালিকার মানে !
আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।

হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়,
পাহাড় কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান—
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।
তুমি শুয়ে রবে তে'-তলার পরে আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে!
সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটির মমতা রসে,
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।
তারি পদ-রজ অঞ্জলি করি, মাথায় লইব তুলি,
সকলের সাথে পথে চলি যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি
আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত পীড়িতের মাখি খুন
লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ।

অনুশীলনী

১। 'দেখিনু সেদিন রেলে'—কে দেখতে পেলেন? কি দেখলেন? এই দৃশ্য কবিকে কি শিক্ষা দিল?

২। 'বলো ত এসব কাহাদের দান?' 'এসব' কথাটি দ্বারা কবি কি বলতে চেয়েছেন? 'এসব' কে কেন 'দান' বলা হয়েছে?

৩। 'দরিদ্র শ্রমজীবি জনসাধারণের প্রতি কবির সহানুভূতি কবিহৃদয়কে সমস্যার গভীরে দৃষ্টিপাত করতে সাহায্য করেছে।'—আলোচনা কর।

৪। 'যে দধীচিদের হাত দিয়ে ঐ বাষ্প শকট চলে'—দধীচি কে? দধীচিদের বলতে কাদের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? 'বাষ্পশকট কি'?

৫। (ক) 'আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ"

উদ্ধৃতিটি কোন কবির কোন কবিতার অন্তর্ভুক্ত ? ইহা কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ? অংশটির মূল কথা সরলভাষায় প্রকাশ কর।

(খ) আজ নিখিলের·······নবারুণ।

'খুন' শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ? ছত্র দুটির মূলভাব প্রকাশ কর। নবারুণ শব্দের অর্থ কি ?

৬। কুলি-মজুরদের ব্যবহৃত যন্ত্রগুলির নাম বল।

৭। প্রথম আট চরণের গদ্যরূপ লেখ।

৮। শব্দার্থ লেখ :

শাবল, গাঁইতি, মজুর, মুটে, রাজপথ, অট্টালিকা, সিক্ত, বেদনা-আর্ত, নবারুণ।

৯। মৌখিক প্রশ্ন :—

(ক) কাজী নজরুল ইস্‌লাম বাংলা সাহিত্যে কি নামে পরিচিত ?

(খ) তাঁর লেখায় সাধারণতঃ কি জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায় ?

(গ) 'চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল' কবি কাদের মিথ্যাবাদী বলেছেন ?

(ঘ) কবি কাদের পদ-রজ মাথায়-করবেন বলেছেন ?

(ঙ) কুলি মজুরের পরিশ্রমে যে সব জিনিষ তৈরী হয় তার কয়েকটির উদাহরণ দাও।

কবি এই কবিতাটি
শ্রমজীবী মানুষদের উদ্দেশ্যে গেয়েছেন।



বাংলার মুখ

জীবনানন্দ দাশ

[কবি জীবনানন্দ দাসের (১৮৯৯-১৯৫৪) আদি নিবাস অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। পরে কলকাতাতেই তাঁর শেষ জীবন কাটে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনায়। কবির উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হ'ল, 'ঝরা পালক', 'ধুসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহা পৃথিবী', 'রূপসী বাংলা', 'সাতটি তারার তিমির'। বর্তমান কবিতাটি 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ হতে সংকলিত।]

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাইনা আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে বসে আছে
ভোরের দয়েল পাখি-চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের করে আছে চুপ ;
ফণীমনসার ঝোপে শটি বনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ;
মধুকর ডিঙ্গা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট-তমালের নীলছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিল ; বেহুলাও একদিন গাঙ্গুরের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,—একদিন অমরায় গিয়ে,
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁট ফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

অনুশীলনী

১। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর' —'বাংলার মুখ' বলতে কবি কি বলতে চেয়েছেন ? 'বাংলার মুখ' কবির কাছে 'পৃথিবীর রূপ'কে কিভাবে ম্লান করে দিয়েছে ?

২। গ্রাম বাংলার সৌন্দর্য কবিকে আকর্ষণ করেছে। কবিতাটি পড়ে নিজের ভাষায় 'বাংলার রূপ' বর্ণনা কর।

৩। টীকা লেখ :

দয়েল, মধুকর, ডিঙা, হিজল, চাঁদ, ইন্দ্র, চম্পা, বেহুলা, গাঙুড়, অমরা, খঞ্জনা।

৪। শব্দার্থ লেখ ও স্বরচিত বাক্যে প্রয়োগ কর :

পল্লব, স্তূপ, অপরূপ, সোনালি।

৫। (ক) 'বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—বেহুলা কে ? ভেলা নিয়ে কোথায় গিয়েছিল ? কাহিনীটি নিজের ভাষায় লেখ।

(খ) 'একদিন অমরায় গিয়ে,
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।'

—প্রাসঙ্গিক কাহিনী বর্ণনা করে ব্যাখ্যা কর।

৬। মৌখিক প্রশ্ন :—

(ক) বেহুলার কাহিনী কোন বই-এ আছে ? কাহিনী জানা থাকলে বল।

(খ) কবি বাংলার কোন রূপ দেখে আর পৃথিবীর রূপ দেখতে চান না ?

(গ) 'নীলছায়া' বলতে কি বুঝ ?

(ঘ) নরম গান কি ?

কবিতাটিতে কবি বাংলার ঘাট, হাট, মাঠের চিরন্তন সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়াছেন।

প্রতিদান

জসীমউদ্দীন

[জসীমউদ্দীন (১৯০৪) গ্রামবাংলার কবি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত কবি প্রধানতঃ কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। 'নক্সীকাঁথার মাঠ' কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। লোকসংগীতের গবেষণায় কবির মৌলিক অবদান আছে। ১৯৭৬ সনের মার্চ মাসে কবি বাংলাদেশে মারা যান।]

আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের ভিখারী—
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি ;
দীঘল রজনী তার তরে জাগি' ঘুম যে হরেছে মোর
আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা আমি তার কুল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি,
যে মোরে দিয়েছে বিষে-ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান ;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটা জনম ভর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি'
রঙীন ফুলের সোহাগ-জড়ানো ফুল মালঞ্চ ধরি।
যে মুখে সে কহে নিঠুরিয়া বাণী,
আমি লয়ে করে তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কি যে আনি' সাজাই নিরন্তর—
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

অনুশীলনী

১। কবির প্রতি কিরূপ বিরূপ আচরণের উল্লেখ আছে? কবি এরূপ আচরণের কি কি প্রতিদান দিতে চান?

২। (ক) "আমার এ ঘর······পর।"

—অংশটি কোন্ কবিতা হ'তে উদ্ধৃত? উদ্ধৃতিটির মূলকথা সবিস্তারে লেখ।

(খ) "কাঁটা পেয়ে তারে······করেছে পর।"

—উদ্ধৃতিটি কোন্ কবিতার অংশ? কবির নাম কি? পংক্তি দু'টির সরলার্থ কর। কবির এরূপ বিপরীত আচরণের কারণ কি?

৩। শব্দার্থ লেখ:

কবর, মালঞ্চ, নিরন্তর, সোহাগ-জড়ানো, দীঘল, বিরাগী, বিষেভরা বাণ।

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) যে মোরে করিল—পথে পথে সাথি—তার—রজনী তার তরে জাগি—যে —মোর—

(খ) যে মুখে—সে কহে — — আমি লয়ে করে তারি — — কাত — হতে কত কি যে আনি — নিরন্তর।

৫। মৌখিক প্রশ্ন:—

(ক) জসীমউদ্দীন কোন দেশের কবি? তার লেখা কোন কবিতা পড়েছ কি? প্রতিদান কথাটির অর্থ বল।

কবি কি ভাবে প্রতিদান দিতে চান দু এক কথায় বল।

বিরূপ আচরণের প্রতিদানে
কবি স্নিগ্ধ ভালবাসা দিতে চান,
এই কথাটি কবিতাটিতে প্রকট হয়েছে।

আগামী

সুকান্ত ভট্টাচার্য

[সুকান্ত ভট্টাচার্য এযুগের কবি শুধু নয়, 'সাধারণ মানুষের সঙ্গে এমন একাত্মতা, সহজ কথা সোজাসুজি বলতে পারার এমন দুঃসাহসী ক্ষমতা সুকান্তর সমসাময়িক আর কোন কবি দেখাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।' জন্ম : ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩৩। মৃত্যু : ২৯শে বৈশাখ, ১৩৫৪]

জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ ;
মাটিতে লালিত ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে,
বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা,
উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা।
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেব সবার সম্মুখে,
ফোটাব বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।
সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড় :
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড় ;
অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারি আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।

আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহতের দলে,
জয়ধ্বনি কিশলয়ে ঃ সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।
ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
সেদিন ছায়ায় এসো ঃ হানো যদি কঠিন কুঠারে,
তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে ;
ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখীরও কূজন
একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন ॥

অনুশীলনী

১। 'জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ' ;
—বক্তা কে ? "জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারে খনিজ"—একথা বক্তা কেন বলেছেন ? অঙ্কুরিত বীজ কথাটির অর্থ বিশ্লেষণ কর।

২। "ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই—জানি আমি ভাবী বনস্পতি"—'আমি' কে ? বক্তা 'ক্ষুদ্র' বা 'তুচ্ছ' নয় কেন ? কি ভাবে বক্তা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে ?

৩। "শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা" —বক্তা কে ? 'অরণ্যের বিশাল চেতনা' অংশটির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা কর।

৪। শব্দার্থ লেখ ও স্বরচিত বাক্যে ইহাদের প্রয়োগ দেখাও ঃ
আগামী, বনস্পতি, কূজন, অঙ্কুরিত, মর্মরধ্বনি, দৃপ্ত, দৃঢ়প্রাণ, জয়ধ্বনি, কিশলয়।

৫। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ।
পুষ্ট, কঠিন, ভাবী, সম্মতি, অন্ধকার, ক্ষুদ্র, গোপনে।
